উৎসব-আনন্দে মগ্ন। উৎসুক নয়নে
লক্ষ হিয়া অপেক্ষিয়া শুভ আগমনে
ছিল চাহি পথপানে ; স্বর্গ অধিবাসী
যেমতি চাহিয়া থাকে—কবে ঘনরাশি
অতিক্রমি ধরাস্পর্শী নীলাম্বর-রেখা
সুখদ বরদরূপে দিবে আসি দেখা।
সন্ধ্যায় উঠিল জ্বলি উদ্ভাসিয়া পথ
সহস্র আলোকমালা, বাদ্য শত শত
বাজিল মধুরে যেন। হেথা পুরাঙ্গনা
দিল মুহুঃ হুলুধ্বনি,—মধুর বাজনা
গাহিল পূরবী-সুরে আগমন-গীতি।
শত পরিজন সাথে জাগাইয়া ভীতি
রণজয়ী বীরবেশে আসিল কুমার
আরোহিয়া চতুর্দ্দোলে। জনক আমার
করিলেন অভ্যর্থনা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
করিলেন ঋক্‌ছন্দে আশীষ-বাচন।
তারপরে বেদী'পরে বিবাহ-সভায়
প্রথমে হেরিনু যবে সে রাতুল পায়
অলক্ষ্যে নমিল মন। ধীর শান্তস্বরে
কহিল আমারে যবে—"এই ধরা'পরে
যাহা কিছু আছে মোর, আজি হ'তে প্রিয়া
সর্ব্বস্ব তোমার হবে, আর মোর হিয়া
সে শুধু তোমার নিত্য! তোমার সে হিয়া
ধর্ম্ম-সাক্ষী লইলাম জীবনে বরিয়া।"—
আমার নির্জ্জীব প্রাণ নাচিল পুলকে,
হেরিলাম সুধামাখা দ্যুলোকে ভূলোকে
কি সুন্দর স্বর্গচ্ছবি! অলক্ষিতে মন
করিল আশ্রয় চির যুগল-চরণ।
শিলাতলে চিররুদ্ধা বুঝি-বা তটিনী
পাষাণ-নিগড় টুটি, পুলকে এমনি
অতিক্রমি দীর্ঘপথ অলক্ষ্যে বিহ্বল
অর্পে সাগরের পদে সর্ব্বস্ব কেবল।

প্রভাতে উঠিল রবি আনন্দ-কিরণে
উদ্ভাসিয়া তরুলতা বিশাল ভুবনে
যেন পুনঃ নবহর্ষে। প্রাণেশ আমার
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য গৃহে আপনার
ফিরিতে উদ্যত যবে, পরাণ কেবল
কাঁদিল মায়ের তরে ; এক ফোঁটা জল
ঝরিল সখীরে স্মরি'। তবু শুধু মন
পতিগৃহ লভিবারে হ'ল উচাটন।
তারপরে পতিগৃহে বন্দি' গুরুজনে
শ্বশুর-শাশুড়ী-আদি, স্নেহ বিতরণে
দেবর-ননদে তোষি, শুধু সুখ-স্নেহে
কমপুষ্প-শয্যাপরে এলাইয়া দেহে
প্রভাতে অরুণ দীপ্ত গগনের মত
হেরিতেছিলাম যবে দীপ্ত ভবিষ্যৎ
আশার আলোকে নব, যেন কাল-ফণী
দংশিল অদৃষ্ট মোর! ভীষণ অশনি
ভাঙ্গিল আশ্রয়তরু ; সুকুমার লতা
রহিনু ভূতলে পড়ি ধূলিবিলুণ্ঠিতা!
যাঁর স্নেহে যাঁর প্রেমে ছিনু গরবিণী
রাজ-কুল-বধূ আমি, রাজেন্দ্র-নন্দিনী,
আরাধ্য দেবতা মোর ধারণা-অতীত—
যাঁর প্রেম করে মোরে নিত্য বিমোহিত
বাল্যসুখস্মৃতি-সম গুঞ্জরি সলিলে,
তাঁর অনুপম দেহ ভাসাইয়া দিলে
গৃহকোণে শূন্যমনে ঘৃণা জ্বালাতন
কেমনে সহিব নিত্য পাষাণ মতন?
শিরে ধরি দেবাশিস্ এ মরণ-খেলা
খেলিতে অকূলে তাই ভাসাইনু ভেলা!
সেই দেহ, যাঁর স্পর্শ সুধার মতন
অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-ধারা করিত বর্ষণ,
ঘৃণিত পতঙ্গ কীট আজি তারে হায়!
করিয়াছে জীর্ণ শীর্ণ! আজি কিছু নাই

সে দেহের অবশিষ্ট। অতীতের মত
বিনষ্ট কোমল তনু! আছে অস্থি-শত
বর্ত্তমান, সম দৃঢ় কঠোর ভীষণ।
আর আমি? আমিও কি রয়েছি তেমন?
করুণ রাজেন্দ্রবালা কুসুমের মত
বিতরিয়া স্নেহ দয়া নরে অবিরত?
কীটের অধম নর, ইন্দ্রিয়ের দাস
আমার সে নারী-মূর্ত্তি করি নিত্য নাশ'
আমারে করেছে আজ যেন কায়াহীনা
মূর্ত্তিমতী কঠোরতা কর্ত্তব্য-ভীষণা!
অতীতে রয়েছে গর্ব্ব, আছে হাহাকার
শোক-সুখস্মৃতি ভরা, অনন্ত উদার
সুমহান্ ভবিষ্যৎ আছে প্রসারিত
আমার সম্মুখে এই সাগরের মত—
অন্তহীন আশাদীপ্ত! শুষ্ক পত্রদল
ঝরি গেছে, পুনর্ব্বার জাগিবে কোমল
নবকিশলয়রাজি! অতীত সে মোর
চম্পকনগরী-সম, দুঃখব্যথা ঘোর
তাহারে রয়েছে ঘিরি'! সে যে গো শ্মশান,
সেথা কি পূরিবে আশা—মিলিবে পরাণ?
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লয়ে ফিরি যাব হায়!
কোমল বালিকা-সম মাতৃ-অঙ্ক প্রায়
সে নগরে কোন্ লাজে? চরণে যাঁহার
সমর্পিণু প্রাণ-মন সর্ব্বস্ব আমার—
নাহি লয়ে সঙ্গে সেই জীবিতেশ স্বামী
কুলের কলঙ্ক হ'য়ে কুললক্ষ্মী আমি
কেমনে ফিরিব পুনঃ! চির পতিহীনা
কেমনে সহিব ব'ল দুর্ব্বিষহ ঘৃণা
নিন্দা গ্লানি জগতের! তবু তার চেয়ে
এ অকূলে মৃত্যু ভাল। শুধু যাব ধেয়ে
তলহীন অতলের বারিরাশি-মাঝে!
স্মরিবে না কেহ মোরে কভু কোন কাজে
কঠোর অবজ্ঞা-ভরে।
মরিব বা কেন?
লভিয়াছি মৃত্যুহীন ভীম-বজ্র হেন
এ-জীবন-বর যদি। অক্লান্ত ছুটিয়া
যা'ব দূর ভবিষ্যতে, আনিব বরিয়া
প্রাণেশে জীবনে মম।
ঐ সিন্ধুকূলে
রাজে স্নিগ্ধ স্বর্গধাম শত ফল-ফুলে,—
প্রার্থিতের কল্পতরু! কিসের সংশয়
আজি! শুধু বেয়ে যাব দিয়ে বিভু-জয়
অনন্তের পানে ভেলা। দেবাঙ্গনাগণ
মধুরে আশার বাণী করি উচ্চারণ
আমারে ডাকিছে যেন!
সর্ব্বশঙ্কাহীন
ছুটে যাই ভবিষ্যতে সারা নিশিদিন। *

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

স্মৃতিহারা।

পিতার সানন্দ অনুমতি পাইয়া বিনোদ মহোল্লাসে কোহিনুরের পাণিপীড়ন করিয়া তাহাকে লইয়া পিতার নিকট চলিয়া যাইল। কোহিনুরের বিবাহ দিয়া তাহার চিন্তা হইতে মাতাপিতা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু সংসার আবার যেন অন্ধকারময় হইয়া আসিল। দিনকত উভয়েরই যেন জীবন শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল; সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল

---

* বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে বেহুলা বিপুলা-নামেই পরিচিতা, বেহুলা অপেক্ষা হৃদয়ের বিশালতার জন্য বিপুলা নামই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বিপুলার সাধনা লিখিত হইল। লেঃ

—'কি করি, কোথায় যাই!' হঠাৎ মণিমোহনের খেয়াল চাপিল; সরোজাকে বলিলেন, 'আর তো কোহিনুরকে ভয় নাই, চল এই সময় দেশে গিয়ে সুশীলের সম্পত্তির ব্যবস্থা করি। সরোজা সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম ব্যবস্থা করবে?" "সব দেবোত্তর করব। সুশীলের পৈতৃক বিগ্রহের মন্দির খুব বড় ক'রে তৈয়ার করাতে হবে, তার সঙ্গে অতিথি-শালা, অনাথ-নিবাস আর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করাব; সুশীলের নামে একটা ইস্কুল আর একটা টোলও প্রতিষ্ঠা করাব; তার পর নিজে তার সমস্ত জমীদারী পরিদর্শন করে যেখানে যেখানে রাস্তা ঘাট কি জলের কষ্ট দেখ্‌ব, তার প্রতীকারের ব্যবস্থা করে আস্‌ব। এখন গিয়ে এই সব আরম্ভ করিয়ে আসি, তারপর মধ্যে মধ্যে গিয়ে গিয়ে দেখে এলেই হবে। সব প্রস্তুত হলে, তখন আবার কিছু দিনের জন্য সেখানে গিয়ে সব প্রতিষ্ঠা ক'রে আস্‌ব।" সরোজা সাগ্রহে সম্মতি দিয়া স্বামীর সহিত তাঁহাদের দেশে উপস্থিত হইলেন্।

মণিমোহন পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন; এদিকে সরোজার অন্তরে সুশীলের যে গুপ্ত শোক ভিতরে ভিতরে তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, এইবার তাহাই একটু ব্যক্ত করিবার অবসর পাইয়া, তিনি যেন অনেকটা বাচিয়া গেলেন। সুশীলের মৃত্যুকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত কেবল কোহিনুরের মুখ চাহিয়া একদিনও সরোজা শোক প্রকাশ করিয়া অন্তরের ভার লঘু করিতে পান নাই; এখন এই পর্য্যাপ্ত অবসরে কেবল সুশীলের চিন্তাতেই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। বিদেশে গিয়া পর্য্যন্ত সুশীল যত চিঠি দিয়াছিলেন, সরোজা এবার সবগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাক্সে লইলেন; সুশীলের অতিপ্রিয় বস্তুগুলিও সঙ্গে লইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া সরোজা অতৃপ্ত চক্ষে সেইগুলি সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিলেন; ফটোখানি ঘরে টেবিলের উপর রাখিলেন, যাহাতে ঘরে ঢুকিলেই আগে চোখে পড়ে।

বিনোদের সহিত আজ ঠিক্ এক বৎসর হইল কোহিনুরের বিবাহ হইয়াছে। দিনটী স্মরণ করিয়া কোহিনুরের জন্য সরোজার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভূমিতে অঞ্চল বিছাইয়া গত জীবনের কত ঘটনাই স্মরণ করিতে করিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। মধ্যাহ্ন-রবি করজাল সংহার করিবার মানসে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়া যেই তাঁহার দুইটী বিদায়-রশ্মি সরোজার মুখের উপর ফেলিলেন, তখন সরোজার জ্ঞান হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুশীলের জন্য তাঁহার মনটা বড় কেমন করিয়া উঠিল। তিনি বৈকালের সেই সমীর-হিল্লোলের আহ্বান অবহেলা করিয়া সুশীলের পুরাতন চিঠিগুলি লইয়া বসিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং সেই পরম স্নেহাস্পদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে সিন্ধু বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সলিল-তর্পণে মৃত আত্মা পরম তৃপ্ত হন; কিন্তু এই শোক-তাপিত ব্যাকুল-হৃদয়ের স্মরণাশ্রু কি সেই বিদেহী আত্মার এতটুকুও তৃপ্তি সাধন করিতে পারে? বসুমতীর হৃদয়প্লাবী সলিল অপেক্ষা স্নেহপূর্ণ হৃদয়প্লাবী নয়নাশ্রুর কি কোন মূল্য নাই? সুশীলের পুরাতন স্মৃতি-চিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে সরোজার দৃষ্টি যখন অশ্রুকলুষিত

হইতেছিল, সেই সময় মণিমোহন পত্রহস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কি এনেছি, বল দেখি!"

সরোজা চিঠিগুলি সরাইয়া চক্ষু মুছিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মণিমোহন আবার বলিলেন, "কি খাওয়াবে, বল দেখি? একটা খবর এনেছি।" সরোজা তখন পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কা'র চিঠি? কোহিনুর ভাল আছে তো?"

"তার শ্বশুর এই চিঠি লিখেছে, প'ড়ে দেখ না।"

স্মিতমুখে পত্রখানি হস্তে লইয়া সরোজা তাহাতে যেই দৃষ্টি সংবদ্ধ করিলেন, অমনি মণিমোহন দুই হস্তে তাঁহার চক্ষু আবরিত করিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে হস্ত অপসারিত করিলেন। সরোজা দেখিলেন, বিনোদের পিতা বড় আনন্দে বৈবাহিককে পত্র দিতেছেন। মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে সরোজার মনে শোকের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও শমিত হয় নাই। পত্রপাঠে সরোজার আনন্দ না হইয়া দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দর দর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। সবিস্ময়ে মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি!"

রুদ্ধস্বরে সরোজা বলিল, "আজ কোহিনুরের এ সৌভাগ্যলক্ষণের সংবাদে আমার যে একটুও আনন্দ হতে পাচ্ছে না! আমার এ কি কপাল! সুশীলের জন্যে বুক যে ফেটে যাচ্ছে! সে জ্বালা আমি কিসে নির্ব্বাপিত কর্‌ব। আমি ত ঠিক জান্‌ছি যে কোহিনুরের সন্তান বুকে করে সে জ্বালা আমার জুড়াবে না!"

মণিমোহন বিরক্ত হইয়া ভ্রুকুটি করিলেন; গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি! সুশীলকে স্মরণ কর, শোক কর, তা'তে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি ক্রমশঃ যা আরম্ভ করেছ, তাতে আমি ব'লে রাখ্‌ছি তোমা হতেই আবার সর্ব্বনাশ হবে। সরোজা তুমি আমায় গোপন করেছ বটে, কিন্তু আমার জান্‌তে বাকি নাই। এবার কোন্ সাহসে সুশীলের চিঠি-পত্র ও তা'র অন্য জিনিস সব বাড়ী থেকে এখানে এনেছ বল দেখি?"

স্বামীর বিরক্তি দেখিয়া সরোজা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কোহিনুর তো এখানে নেই। আমার বড় মন হু হু কর্‌তো তাই নিয়ে এসেছিলাম।"

"কিন্তু এখন তো আবার সে আস্‌চে।"

"আর কোন চিহ্ন বাড়ীতে রাখ্‌ব না। এই নাও তোমারই হাতে সব দিয়ে দিচ্ছি, তুমি যা কর্‌বার কর।" এই বলিয়া সরোজা সমুদায় মণিমোহনের সম্মুখে রাখিলেন।

ইহার কয়েকমাস পরে মণিমোহন কোহিনুরকে কলিকাতায় আনিলেন। বিনোদও সঙ্গে আসিলেন; কিন্তু বেশী দিন বিনোদের কলিকাতায় থাকা হইল না। বিনোদ হঠাৎ জাপান-ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিল। সুদীর্ঘকাল সুখ-মিলনের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে। কাঁদিয়া কোহিনুর বিনোদকে বিদায় দিল; কাঁদিয়া ও কাঁদাইয়া বিনোদ কোহিনুরের নিকট বিদায় লইল।

বিনোদ চলিয়া যাইবার পর কোহিনুর প্রথম প্রথম কিছু দিন কিছুতেই মনের প্রফুল্লতা ফিরাইতে পারিল না। তাহার এই বিমর্ষতা তাহার মাতাপিতার চক্ষু

এড়াইল না। তাঁহারা নানা উপায়ে সর্ব্বদা তাহার মন ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সরোজা নিজের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজে তাহাকে ব্যস্ত রাখিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মন একটু শান্ত হইয়া আসিল। তখন কোহিনুর আবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল দেখিয়া মাতাপিতারও অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সে-দিন বিনোদের চিঠি আসিবার কথা ছিল, আসিল না। কোহিনুরের সে-দিন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মন অন্তমনস্ক করিবার জন্ত সে মাতার কক্ষে বইয়ের আলমারী খুলিয়া ঝাড়িতে বসিয়াছিল, হঠাৎ একখান বই হাত হইতে পড়িয়া মলাটের পাতা উল্টাইয়া গেল। কোহিনুর বইখানি তুলিয়া সোজা করিয়া ধরিতেই তাহাতে তাহারই নাম লেখা দেখিতে পাইল। সেটি উপহার-পৃষ্ঠা ;—লেখা আছে "কোহিনুরের কোমল হস্তে পরম আদরে উপহার দিলাম।

সুশীল।"

কোহিনুর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল—"কে এ সুশীল? সুশীল! সুশীল কে? আমায় আদর-উপহার দিয়াছে, আর আমি তো মোটেই মনে আন্‌তে পাচ্চি না! 'সুশীল!' নাম কি কখনও শুনেছি? কৈ না! কিন্তু নামটি মুখে আন্‌তে যেন জিভে বেধে যাচ্চে! কেন? কে এ সুশীল? দূর হোক্, যা মনে নেই তার জন্তে ভেবে মর্‌তে পারি না!" পরে ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, "ভোলার আশ্চর্য্যই বা কি! সেই এক নাম এক চিন্তা ছাড়া আর কিই বা মনে আছে! আগে যাও বা অন্ত চিন্তা কিছু ছিল, দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে সব লোপ পেয়ে গেছে।" কিন্তু তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মনে আসিতে লাগিল—'কে সুশীল?'

সরোজা কোহিনুরের মধ্যে মধ্যে চিন্তাপূর্ণ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "থেকে থেকে অত কি ভাবছিস্ রে কোহিনুর?" কোহিনুর উত্তর করিল, "সামান্ত একটা কথা মা! কিন্তু মনে যত ভাবচি ভাব্‌ব না, তত সে মনে আস্‌ছে।" "কি কথা?" কোহিনুর বলিতে গিয়া সুশীলের নাম উচ্চারণ করিতে প্রথমে বাধ বাধ বোধ করিতে লাগিল ; শেষে সঙ্কোচ ঠেলিয়া বলিল, "মা আলমারীতে একখান বইয়ে আমার নাম লেখা রয়েছে ; সুশীল আমায় উপহার দিয়েছে। সুশীল কে মা? আমি কিছুতে মনে কর্‌তে পাচ্চি নে!" কোহিনুর মায়ের মুখের প্রতি চাহিল।

প্রশ্ন শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে সরোজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বইখানি যে আলমারীতে ছিল, ইহা সরোজার স্মরণই ছিল না। মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কোহিনুরও বিস্মিতা হইল ; ভাবিল—"আমি কি মা'র মনে ব্যথা দিলাম? তবে কি সুশীল মা'র কোন মৃত আত্মীয়! আমি হয় তো তখন খুব ছোট ছিলাম, তাই আমার মনে নাই।" এই ভাবিয়া সে পুনরায় বলিল, 'মা, যাক্! আর ও-কথায় কাজ নাই। বাজে কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার মনের একটা দোষ দাঁড়িয়েছে। চল সুমতিদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। তা'র মা'র জ্বর তো আজও সারে নি! দেখে আস্‌বে না?" সরোজা তখন প্রকৃতিস্থা হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওঁকে বলে এস, নইলে তোমায় এখনি খুঁজ্‌বেন।"

ইহার পর সরোজা আবার অতিসতর্ক হইলেন; আর কোন জিনিষ কোথাও ফেলিয়া-রাখিয়াছেন কি না বিশেষ করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন স্বামীর হাতে সুশীলের অন্য সব জিনিষ দিলেও সুশীলের ছবিখানি সরোজা নিজের কাছেই রাখিয়া-ছিলেন। যে বাক্সে গহনার ছবি ছিল, তাহার চাবি আবার সরোজা অতিসাবধান করিয়া রাখিলেন।

মাস-দুই বেশ কাটিয়া গেল। এই সময় মণিমোহন সুশীলের জমীদারীর ম্যানেজারের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, মণিমোহনের আদেশ-মত সমস্ত প্রস্তুত, তিনি গিয়া যথারীতি প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিলেই হয়।" পত্নী ও কন্যাকে অভিভাবকহীন অবস্থায় রাখিয়া যাইতে মণিমোহনের আদৌ ইচ্ছা হইল না; কিন্তু সঙ্কল্পিত কার্য্যের যখন সমস্তই প্রস্তুত তখন অনর্থক বিলম্ব করাও অনভি-প্রেত। মানুষের কখন কি হয় কে জানে, ভাবিয়া মণিমোহন সরোজাকে খুব সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিলেন এবং কোহিনুরকে স্নেহাদরে প্রবোধ দিয়া অভীষ্ট স্থানে রওনা হইলেন। কোহিনুর জানিল, পিতা নিজের বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেন।

মণিমোহনের গমনের সপ্তাহখানের পরে সরোজা হঠাৎ পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই কোহিনুর ডাক্তার আনাইল, কিন্তু তবু রোগের বৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হইল না; ক্রমে ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইয়া রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িল। পিতার অনুপস্থিতিতে মাতার এই অসুখে কোহিনুর অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। পিতা পাছে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন ভাবিয়া মাতার সামান্য অসুখ জানাইয়া সে জানিতে চহিল, তিনি কবে ফিরিবেন। উত্তরে মণিমোহন জানাইলেন, তাঁহার আসিতে এখনও কিছুদিন বিলম্ব আছে, তবে সরোজার পীড়া যদি গুরুতর হয়, তাহা হইলে সংবাদ পাইলেই তিনি চলিয়া আসিবেন। চিকিৎসকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "অসুখ খুবই, কিন্তু জীবনের কোন আশঙ্কা হয় নাই। সারিয়া যাইবে, তবে সময় লাগিবে। তিনি এখনি আসিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন্ না। অতএব মিথ্যা তাঁহাকে কাজের ক্ষতি করাইয়া টানিয়া আনার কি আবশ্যকতা?" চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিয়া কোহিনুর পিতাকে তৎক্ষণাৎ আসিবার জন্য আর অনুরোধ করিল না; আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জননীর সেবা করিতে লাগিল।

যখন কোহিনুর মায়ের শিয়রে বসিয়া রাত্রি জাগিতেছিল, তখন যেমন নির্ম্মল আকাশে এক এক বার বিদ্যুদ্-বিকাশ হয় সেইরূপ এক এক বার তাহার মনে আসিতে-ছিল,—"এমনি আর কা'র অসুখে মথার কাছে বসিয়া বসিয়া রাত্রি জাগিয়াছি!—কে? বাবার! কই না! বাবার তো তেমন অসুখ আমার মনে পড়ে না; তবে কা'র? যেন কোন পুরুষেরই বলে মনে হয়! কে সে? কিন্তু কৈ আর ত কিছুই মনে পড়ে না!" কোহিনুর সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন মাতার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিল, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুৎ-চমকের মত সেই কথা মনে পড়িতে লাগিল। শেষে কোহিনুর হাল ছাড়িয়া ভাবিতে লাগিল, 'মা'র অসুখে ভাব-

নায় ভাবনায় অনিদ্রায় আমার মাথা বিগ্‌ড়েছে দেখ্‌ছি! কিন্তু কৈ শরীরে ত কোন ক্লান্তি অনুভব করি না। দেখা যাক্‌ ভেবে।' এই বলিয়া সে আবার ভাবিতে লাগিলে। সরোজার যদি একটুও চৈতন্য থাকিত, তবে তিনি কোহিনুরকে কখনই অমন করিয়া বসিয়া রাত্রি জাগিতে দিতেন না ; কিন্তু দুইদিন তিনি একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন। তৃতীয় দিনে তাঁহার একটু জ্ঞান হইলে, তিনি কোহিনুরকে দেখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কোহিনুর! তোর চোখের কোলে এত কালী পড়েছে কেন মা? ক'দিন বুঝি ঘুমাও নি?" কোহিনুর তখন মায়ের বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ; বলিল, "মা তুমি যে দু-দিন চোখ মেলে চাও নি! আমি কি তোমায় সে অবস্থায় ফেলে ঘুমাতে পারি?" সরোজা সেই স্নেহের ধনকে ক্ষীণ বাহুর বেষ্টনে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহারও ক্লান্ত চক্ষু-দুইটিতে স্নেহ-বিন্দু মুক্তার মত ঝরিতে লাগিল।

ডাক্তার দিন দিন আশা দিতে লাগিলেন, কোহিনুর অনেকটাও নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু মণিমোহন তখনও লিখিতে লাগিলেন, তাঁহার আসিতে তখনও বিলম্ব আছে। আবশ্যক বুঝিলে যেন তাঁহাকে সত্বর সংবাদ দেওয়া হয়।

একদিন কোহিনুর সরোজাকে বলিল, "মা তোমার বাক্সে তো আর টাকা নেই। ডাক্তারবাবুর ফি দিতে হবে, তা ছাড়া সংসার-খরচেরও ত দরকার। নিরুপায় ব্যধি-পীড়িতা সরোজা মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহার গহনার বাক্সে যথেষ্ট টাকা ছিল, কিন্তু সেই বাক্সেই সুশীলের ছবি আছে বলিয়া সরোজা কখনও সে বাক্স কোহিনুরকে খুলিতে দিতেন না। আজ তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত, মণিমোহন অনুপস্থিত। আজ তো কোহিনুরকে চাবি না দিলে উপায় নাই। তিনি খানিক ভাবিয়া বলিলেন, আমার হাতবাক্সে লোহার সিন্দুকের চাবি আছে, সিন্দুক খুলে আমার গহনার বাক্স নিয়ে এস।' আমি তা থেকে টাকা বার করে দিচ্ছি। সে-টাকা আমি গোপনে রেখেছি, তুমি তো খুঁজে পাবে না।" কোহিনুর বাক্স বাহির করিয়া মায়ের কাছে রাখিল। জিহ্বার শুষ্কতা ও কোহিনুরের নিকট হইতে সুশীলের ফটো লুকাইবার জন্য তিনি কোহিনুরকে বলিলেন, "বড় তৃষ্ণা পাচ্ছে আমার, একটু বেদানার রস করে দাও তো মা। আমি ততক্ষণ টাকা বার করে রাখি।" কোহিনুর মাতৃ-আজ্ঞা পালনে রত হইলে সরোজা ক্ষিপ্রহস্তে ছবিখানি বাহির করিয়া আগে শয্যাতলে লুকাইলেন। কিন্তু সেইটুকু শ্রমেই তাঁহার রুগ্ন দুর্ব্বল হস্ত অবসন্নপ্রায় হইয়া আসিল। তারপর টাকার তোড়া ধরিয়া যেমন তুলিতে যাইবেন, হাত কাঁপিয়া বাক্সের উপর পড়িয়া গেল, বাক্সও ফাৎ হইয়া পড়ায় কতক জিনিষ ওলট-পালট খাইয়া, দু-একটা বা ছিট্‌কাইয়া মেঝেয় গিয়া পড়িল। কোহিনুর তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সামলাইয়া লইল। সে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, কোথাও লাগিয়াছে কি না? সরোজা যথাসাধ্য মুখে প্রফুল্লতা আনিতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "না লাগে নি; তবে এত দুর্ব্বল হয়েছি, তা আগে অনুভব করতে পারি নি। আমার রসটুকু খাইয়ে তুমি সব

গুছিয়ে তোল মা।” কোহিনুর সব গুছাইয়া বাক্সে তুলিতে যাইবে, সেই সময় একটা অঙ্গুরীয়ের উপর তাহার পা পড়িল। কোহিনুর হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিল, উজ্জ্বল হীরার আংটি; তাহার ভিতরে নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে —“সুশীল।”

আবার সুশীল! কোহিনুর এবার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। আংটিটি হাতে করিয়া সরোজার কাছে আনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ মা, ইনি কি তোমার কেউ আত্মীয় ছিলেন? আংটিতে এই যে নাম লেখা রয়েছে!” এবারেও কোহিনুর স্পষ্ট সুশীলের নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না। সরোজা ভাবিয়াছিলেন সুশীলের ছবি লুকাইতে পারিয়াই তিনি নিরাপদ্ হইয়াছেন; কিন্তু ‘খোড়ার পাই খানায় পড়ে।’ তিনি সর্ব্বদা যে ভয় করেন, তাহারই সুযোগ ঘটিয়া যায়, দেখিয়া তিনি আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। কোহিনুর জননীর মুখভাব এবারেও লক্ষ্য করিল, কিন্তু এবার প্রসঙ্গ চাপা দিল না। সেও অতি-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “মা ইনি কি তবে বেঁচে নেই? ইনি কে মা? তোমার ভাই ছিলেন কি, না ছেলে? তুমি বোধ হয় তাঁকে খুব ভাল বাস্‌তে, তাই তাঁর নাম হলেই কেমন হয়ে যাও! নয় মা? আমায় কিন্তু তাঁর কথা বল মা, আমার কেমন শুন্‌তে বড় ইচ্ছে হয়।” সরোজার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন—“কোহিনুর, মাতৃহত্যা করবি! ও-নাম তুই আর আমার কাছে করিস্ নে। ওরে তা হ’লে আমি তখনি মরে যাব।” বলিয়াই সরোজা হাঁপাইতে লাগিলেন। কোহিনুর মায়ের মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সেদিন সরোজার অসুখ আবার বাড়িয়া গেল। কিন্তু সেইদিন হইতে সুশীলের কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া কোহিনুরের মনে অবিরত উঁকি দিতে লাগিল সে ভাবিল, পিতা আসিলে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

মণিমোহন দেশ হইতে ফিরিলেন, কিন্তু সরোজার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কন্যাকে বলিলেন, “মা, তোমার এই শরীরে এত বড় রোগ লইয়া যুঝিতেছ, আমার কিছু লেখ নি।”

“বাবা দূরের সংবাদে আপনার কেবল উৎকণ্ঠা বেশী হত, ব্যই তো নয়। কিন্তু আপনি এলেন, আমি এবার নিশ্চিন্ত হলাম। এক এক দিন এত ভয় হত, কেবল ডাক্তার-বাবু অভয় দিতেন, তাই আপনাকে টেলিগ্রাম করি নি।”

এবার সরোজা দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন বহুকাল একটি কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে রোগীর চিত্ত স্বতঃই অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে, এজন্য কোহিনুর একদিবস মাতাকে বলিল, “মা আজ তোমার ঘর বদ্‌লে দিই এ ঘরটা আজ ঝেড়েঝুড়ে ধুয়ে ফেলুক, বিছানাগুলো সব রোদে ফেলে দিক্।” সরোজা হাসিয়া বলিলেন, “আমি তো তোমার খুকী হয়েছি। মা, যা করবে কর।” সরোজাকে চেয়ারে বসাইয়া অপর গৃহে লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়ান হইল। এ ঘর কোহিনুর চাকরদের দিয়া পরিষ্কার করাইতে লাগিল। সরোজা যে সেইদিন সুশীলের ছবি লইয়া নিজ শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,

তাহার বিষয় আর তাঁহার মনে ছিল না; মনে হইলে মণিমোহনের হাত দিয়া যথাস্থানে রাখাইতে পারিতেন। আজ বিছানা তুলিতে গিয়া সেই ছবি কোহিনুরের চোখে পড়িল। কোহিনুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই ছবি দেখিতে লাগিল। আজ এ-ছবি কোহিনুরের চক্ষে নূতন বটে! কিন্তু ইহাতে কই নূতনতা তো কিছু নাই! এ যেন কোহিনুরের কত দিনের পুরাতন চির-পরিচিত চির-সুহৃদ্! কোহিনুরের কত নিদ্রা যেন ইঁহারই স্বপ্নে কাটিয়াছে; কত চিন্তা যেন ইহাকেই যুগে যুগে স্মরণ করিয়াছে! কে এ? এ কি কোহিনুরের জন্মান্তরের সাথী? না, ইহ-জীবনের কোনও প্রহেলিকার দেশে কোহি-নুর ইহাকে সাথী পাইয়াছিল! এই অপরিচিত মূক সৌন্দর্য্য কোহিনুরের কানে কত চির-পরিচিতের কাহিনী শুনাইবার জন্য যেন উন্মন করিতেছে! কি সে কাহিনী! কে এ সুন্দর!

কোহিনুর সেই ছবি যত দেখিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে ততই একটা অচিন্তনীয় প্রীতির উৎস ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। জননীর শয্যাভ্যন্তরে এই মূর্ত্তি লুকান ছিল। কোহি-নুর বুঝিল, এ-ছবি মায়ের অতিস্নেহের হৃদয়াঙ্কিত ধনের, সন্দেহ নাই। তবে কি এই সুশীল? কোহিনুর ভাবিতে লাগিল, 'এ তাহারই সহোদর নয় তো? হয় তো বহুদিন পূর্ব্বে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, তাই মা তা'র মধুর স্মৃতি এত গোপনে এত সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। সন্তান না হইলে আর কাহার স্মরণে মা'র অত মনোবেদনা উথলিয়া উঠিবে? রোদনে পাছে অকল্যাণ হয়, তাই মা হয় তো কাঁদেন্ না। তবে তো বাবাকেও এ-কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়! এ-ছবি আমারই কাছে এখন থাক্। তাঁকে দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর যা হয় কর্‌ব। কিন্তু নিশ্চয় এ আমার কোন আপন জন। রক্তের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হ'লে কেন এত দেখিতে ভাল লাগিতেছে? আমার কৌতূহল কিন্তু আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, এ কার ছবি?—হে সুন্দর! কে তুমি?'

(ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

গান।

সাহানা—একতালা।

নীলিমার মাঝে সুষমা হেরিতে—
নয়ন হয়েছে ভোর!
ব্যাকুলিত চিত কাঁদিয়া আকুল,
অবিরল বহে লোর!
কোথা অফুরন্ — কোথা অপরূপ,
দেখাও তোমার অতুল স্বরূপ;
নয়নের বাধা তুলে দিয়ে মোর—
ঘুচাও সকল ঘোর!
ব্যথা ত ঘোচে না, এ-চিত জাগে না;
আশার আশায় থাকি!—
কবে কোন্ দিনে, কোন্ শুভক্ষণে
নয়নে নয়ন রাখি'—

দাঁড়াবে হে স্বামী চির প্রেমময়,
দেখাবে তোমারে তোমারি বিভায়,
গোপন মনের মোহন মায়ার
ছিঁড়িয়া কঠিন ডোর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

চক্র-পথে।

আজ পেয়েছি তোমার দেখা
পথে গো!
চল্‌তেছিনু লক্ষ্যপানে
এক-ধেয়ানের রথে গো!
অনিল- ও ফুল-চতুর্দ্দোলে
পান্থ ওহে, উদয় হ'লে!
ফুটিয়ে গেলে প্রাণের হেনা
প্রাচীন চেনার মতে গো!

আজুকে পেনু তোমার দেখা
পথে গো!—
ফুলের বনে ধীর পবনে
এক-মনের রথে গো!
দেখনু দোঁহে দোঁহার মুখে
হঠাৎ হাসি অনেক সুখে,
চল্‌নু ফিরে যে যার দিকে
চঞ্চরীকের ব্রতে গো!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অপ্রাকৃতে বিশ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমে ভূত-চিকিৎসক অথবা ওঝাদিগের কথা ধরা যাউক্। আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে এই ওঝাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি দেখা যায়। অসভ্য দেশগুলিতে ধর্ম্মযাজকরাই ওঝা হয় এবং সেই দেশগুলিতে ইঁহাদের প্রতিপত্তি আরও অধিক। সাধারণতঃ অশিক্ষিত নরনারীগণ এই ওঝাদিগকে ভয় ও সম্ভ্রম করিয়া চলে। ওঝাগণও সকল দেশে নানারকম অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। ওঝাগণ কিরূপে ভূত নামায় তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। তাহাদের এই ভূত নামানর রহস্য ক্রমশঃ লোকসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং ইহার এস্থানে বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ইহার ফলে ওঝাদিগের পসার কমিতেছে। ওঝারা কিরূপে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত একটী ঢিল ফেলিয়া ভূতের আগমন জ্ঞাপন করে এবং তৎপরে (Ventriloquism) স্বরবিকৃতি করিয়া ভূতের স্বর অনুকরণ করে তাহাও সকলে জানেন। এই বিষয়ে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিত 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা'য় একটী অতিসুন্দর হাস্য-রসাত্মক গল্প আছে।

পাঠকবর্গকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তারপর ওঝাদিগের প্রধান কার্য্য ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করা। এ-বিষয়ের তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভূতগ্রস্ত হওয়ার অর্থ কি তাহার বিচার কর্ত্তব্য। ছোট ছেলেদের যখন ভূতে ধরে তখন তাহাকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে। পেঁচোয় পাইলে শিশু দিন দিন রোগা হইতে থাকে এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, পেঁচো নামে এক প্রকার ভূতযোনি আছে; তাহারাই শিশুকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন তাহাকে শোষণ করে এবং অবশেষে মৃত্যু-মুখে পাতিত করে। কিন্তু এ বিশ্বাসের মূলে কিছুই সত্য নাই। 'পেঁচোয় পাওয়া' এক-প্রকার শিশুরোগমাত্র। এই রোগের একটা প্রকাণ্ড ডাক্তারী নাম আছে। এইরূপ পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের ভূতগ্রস্ত হওয়াও একপ্রকার রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূতগ্রস্ত হওয়ার পর ভূতগ্রস্ত রোগীর দেহে যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, অনেক মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীর দেহেও সেই সকল লক্ষণ দেখা যায়। অতএব ভূতগ্রস্ত হওয়া ও মূর্চ্ছারোগের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা মনে করা স্বাভাবিক। এই ভূতগ্রস্ত হওয়া রোগের নাম আমরা ভূতরোগ দিতে ইচ্ছা করি। ওঝাদিগের কার্য্য এই ভূতরোগ আরোগ্য করা এবং অনেক সময় ওঝাগণ আরোগ্যকার্য্যে সফলও হয়। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। ডাক্তার রোগ আরোগ্য করিলে যেমন তাহাতে আশ্চর্য্য-জনক কিছু নাই, তদ্রূপ ওঝাও ভূত তাড়াইলে তাহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। যেমন কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, তদ্রূপ ওঝাগণ যে সরিষা-পড়া, চাল পড়া প্রভৃতি ব্যবহার করে, তাহার মধ্যে এরূপ কোন দ্রব্যগুণ থাকিতে পারে যাহা ভূতরোগের প্রতিষেধক। আর ওঝারা যা মন্ত্র বলে, তাহা লোক দেখাইবার জন্য। আর একটা কথা শুনা যায় যে, ভূত আশ্রিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে নিকটস্থ বৃক্ষের একটা ডাল অথবা একটা প্রাচীর ভগ্ন করিয়া চলিয়া যায়; এ-কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও আজ্‌-গুবী। এই প্রসঙ্গে পথিকের পথভ্রম-কারী আলেয়ার কথাও স্মর্ত্তব্য। ভূতে পাওয়া যেরূপ এক প্রকার রোগ, সেইরূপ আলেয়াও একপ্রকার Marsh gas, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ওঝাদের বুজরুকী, ভূতে পাওয়া, অথবা আলেয়া হইতে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক্, ভূতসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ ভূত সম্বন্ধে যে গল্পগুলি শুনা যায় এবং ভূতবাদী কেতাবগুলিতে যে-সব উদ্ভট গল্প পড়া যায়, সেগুলি এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) সহসা কোন মৃত ব্যক্তির স্পষ্ট আকৃতি-দর্শন; (২) কাহাকেও ভূত দেখান; (৩) কোন গৃহে ভূতের উৎপাত হয়; (৪) বহুকাল মৃত কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেয়; (৫) (Nightmare) নিশির ডাক; (৬) অপ্রাকৃত কিছু দর্শন, যথা মস্তকহীন মনুষ্য চলিতেছে, দানোয় পাওয়া ইত্যাদি। এক্ষণে একটী একটী করিয়া বিচার করা যাক্।

প্রথমতঃ সহসা কোন মৃত ব্যক্তির স্পষ্ট আকৃতি-দর্শন। ইহার অনেক গল্প শুনা যায়। ডাক্তারগণ মৃত রোগীর বিভীষিকাময়ী আকৃতি চক্ষুর সম্মুখে বিকট হাস্য করিতেছে, দেখেন। কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ অথবা শ্মশানে দগ্ধ করিবার পর তাহার পাঠগৃহে তাহার মূর্ত্তি চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছে, ইহাও অনেকে দেখেন; কিন্তু এসকল দৃশ্য কেবল কল্পনা-জাত। ম্যাক্‌বেথ্ যে-জ্ঞানে শূন্য রক্তাক্ত ছুরিকা দেখিয়াছিলেন, যে জ্ঞানে 'Macbeth doth murder sleep'—এই বাণী শুনিয়াছিলেন, উপরি উক্ত চিত্রগুলিও সেই জ্ঞানে দেখা। ডাক্তার—যাঁহার মধ্যে মৃত রোগীর কল্পনা আছে—সেই মৃত রোগীকে ক্ষণিকের তরে দেখেন; একজন তৃতীয় ব্যক্তি, যে মৃত ব্যক্তিকে জানে না, পূর্ব্বে দেখে নাই বা তাহার কোন সংবাদই রাখে না, সে কখন তাহাকে দেখে না। মৃত ব্যক্তির আকৃতি পাঠাগারে বসিয়া অধ্যয়নরত, ইহা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরাই দেখেন; একজন তৃতীয় ব্যক্তি, যে মৃত-ব্যক্তির চেহারা আগে দেখে নাই, সে দেখে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, উক্ত চিত্রগুলি কল্পনাজাত। আবার এরূপ শুনা যায় যে, দূর-প্রবাসস্থ কোন ব্যক্তি, কোথায় কিছু নাই, সহসা দেখিল তাহার স্বদেশস্থ কোন আত্মীয় সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 'আমি যাচ্ছি' ইত্যাদি প্রকারের কথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল; তার পর চিঠি লিখিয়া জানা গেল যে উক্ত সময়ে উক্ত আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। এগুলির সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার নিজের জীবনে কখনও এরূপ দেখি নাই কিংবা কোন পরিচিত শিক্ষিত ও বিশ্বাসী লোকেরনিকট এরূপ কথা কখনও শুনি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কাহাকেও ভূত দেখান। এ-শ্রেণীর গল্প অনেক জানি এবং আমাকেও অনেকে ভূত দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিবারই তাঁহারা নিজে ভূত সাজিয়া অথবা অপর কাহাকেও ভূত সাজাইয়া বাঁশ-ঝাড় অথবা বেলগাছ হইতে ভয় দেখাইতেন। একবার এক্‌স্থানে ম্যাজিক্ দেখিতে গিয়াছিলাম; যাদুকর (magician) অনেক ম্যাজিক দেখাইবার পর বলিলেন, "এক্ষণে ভূত দেখাইব।" এই বলিয়া তিনি ভূত-দর্শনাভীপ্সু কোন সাহসী ব্যক্তিকে আসিতে বলিলেন। ইহাতে একটী গোরা সৈনিক তাঁহার নিকট উঠিয়া গেল। অতঃপর তিনি spiritualism ও ভূতবাদের সত্যতার উপর একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সেই গোরা সৈনিককে চেয়ারে বসাইয়া তাহার চারিপার্শ্বে কিয়দ্দূর-পর্য্যন্ত কাপড় দিয়া ঘিরিয়া দিলেন। দর্শকবৃন্দ আর ভিতরের কিছুই দেখিতে পাইল না। ইহার পর যাদুকর কি করিল, ঈশ্বরই জানেন, সেই ইংরাজ বীর যখন বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার মুখমণ্ডল ভয়ব্যাকুলিত! ভীতিসন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে, দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় সে ছুটিয়া আসিতেছে! তখন তাহাকে ধরিয়া, মাথায় জল প্রভৃতি দিয়া প্রকৃতিস্থ করা হইল। ব্যাপারটা কি তাহা সে-সময়ে বুঝিতে পারি নাই। সৈনিকটী যাদুকরের অপরিচিত, সুতরাং, স্বেচ্ছায় ওরূপ করিবার তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। পরে শুনিলাম, সৈনিকটীর উপর Laughing gasএর ন্যায় এক প্রকার গ্যাস প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, কোন কোন গৃহে ভূতের উপদ্রব হয়। ইহা বহু পুস্তকে পাঠ করা যায় এবং অনেকের মুখে শুনাও যায়, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা দেখা যায় অতিশয় অল্প। গৃহে প্রায়ই ইষ্টক, অস্থি ও অন্যান্য দ্রব্য পতিত হইয়া গৃহস্থকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলে; কিন্তু এরূপ ঘটনা এতটা অসম্ভব যে অবিশ্বাস্ত। খুব সম্ভব, ওরূপ ঘটনা ঘটিলে, তাহা পাড়ার দুষ্ট লোকদিগের কার্য্য অথবা অতিসন্তর্পণে, অতিলুকায়িতভাবে কৃত কোন মতলব-বাজ লোকের কার্য্য। অন্যথা এরূপ ঘটনা অসম্ভব। আমি এ-পর্য্যন্ত কোন গৃহে ওরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখি নাই এবং ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাই নাই। সুতরাং ইহার জন্য ভূতে বিশ্বাস করা যায় না।

আবার এরূপ শুনা যায়, কোন কোন গৃহে যে যে পরিবার বাস করিয়াছে, সেই সেই পরিবারস্থ কেহ না কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এ ঘটনাটি সত্য বলিয়া স্বীকার করি এবং এরূপ দুই একটী বাড়ীও দেখিয়াছি। অনেকে মনে করেন, ঐ সকল বাটীতে ভূত আছে বলিয়া ঐরূপ হয়। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এক সময় না এক সময় মনুষ্যকে মরিতেই হইবে;—তাহা এ-বাড়ীতেই বা কি, ও-বাড়ীতেই বা কি? অতএব এই বাড়ীতে অনেকে মরে বলিয়া এই বাড়ীতে ভূত আছে, ইহা মনে করা ঠিক্ নহে। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর অন্য কারণ থাকিতে পারে। হয় ত গৃহটী দোষযুক্ত; হয়ত, সেই গৃহের মৃত্তিকাতল হইতে কোন প্রকার বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত হইতে পারে, যাহা-দ্বারা গৃহবাসী কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইতে পারে। কলিকাতার পুকুর-বুজান জমির উপর নির্ম্মিত অনেক গৃহের নিম্নতল হইতে এরূপ বিষাক্ত বাষ্প উঠা অসম্ভব নহে।

চতুর্থতঃ, মৃতব্যক্তি শরীরধারণপূর্ব্বক আসিয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেয়, নিজের পরিচয় দেয় ইত্যাদি। এ-সকল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কথা। অতিবিশ্বাসীর মুখ হইতে শুনিলেও এ-সকল ব্যাপার নিজে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনেক জিনিশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। স্বীকার করি, তাহা ঠিক; ইংলণ্ড কখনও দেখি নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের অস্তিত্বে কখন সন্দেহ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায় না।

পঞ্চমতঃ, Nightmare, somnambulism, নিশির ডাক ইত্যাদি। এগুলি কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতিরহস্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দুইটী অর্থাৎ Nightmare ও Somnambulism দুই প্রকার রোগ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; কেবল নিশির ডাকে একটু রহস্য এখনও অবশিষ্ট আছে। নিশির ডাক দুই প্রকার:—এক প্রকার মনুষ্যের ডাক, আর একপ্রকার ভূতের ডাক। যখন মনুষ্য নিশি সাজিয়া ডাকে, তখন সে যে উদ্দেশ্যেই ডাকুক, তাহাতে ভূতের নাম-গন্ধও নাই; আর যখন স্বয়ং ভূত আসিয়া ডাকেন্ তখন অবশ্য তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মূল ব্যাপার হইল, নিশির ডাক জিনিশটাই অবাস্তব—কাল্পনিক। কেহ ডাকিতেছে স্বপ্ন দেখিয়া, তাহার উত্তর দিতে গিয়া সুপ্ত স্বর ফুটিয়া বাহির হইলেই, লোকে ভাবে

নিশির ডাকের উত্তর দিতেছে।

সর্ব্বশেষে দানোয় পাওয়া, অপ্রাকৃত-দর্শন ইত্যাদি। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মৃত ভাবিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে যাইতে, হয় ত সে বাঁচিয়া উঠিল। অশিক্ষিতগণ ভাবিল, তাহাকে দানোয় পাইয়াছে। তখন তাহাকে প্রহার করিয়া এইবার সত্য সত্যই মারিয়া ফেলিল। এইরূপ কত শতশত অর্দ্ধ-জীবিত ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? অতএব দেখা যাইতেছে যে, জীবিতাবস্থারই একটি অবস্থার নাম দানোয় পাওয়া। সুতরাং ইহা ভূত নহে। আবার কখনও কখনও শুনা যায় যে, যদি কেহ জলে ডুবিয়া মরিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই জলের ধারে তাহার প্রেতমূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে না-কি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু স্বচক্ষে দেখিবার ভাগ্য আমার কখন ঘটে নাই।

অনেকে মস্তকহীন মনুষ্য, অশ্বারোহী ভূত প্রভৃতি দেখেন। ইহার অধিকাংশই আজগবী অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দুই একটী যাহা সত্য, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। রাত্রে গ্রাম্যপথে যাইতে যাইতে সহসা সম্মুখে দেখিলাম, মস্তকহীন কে যেন অচল অটল ভাবেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে! প্রথমে ভয় হইল; অবশেষে লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, তাহা একটি শাখাপত্রহীন বৃক্ষের মৃত কাণ্ড-মাত্র। এইরূপ প্রথমের ভীতি শেষে হাস্যে পরিণত হয়। সুতরাং, এগুলি ভূতের অস্তিত্বের কিছুই প্রমাণ করে না। এই প্রসঙ্গে পাঠক-বর্গকে Washington Irving লিখিত 'Legend of the Sleepy Hollow', Addison-এর Spectator-এর Coverley papers-এ ভূতবিষয়ক একটী যে প্রবন্ধ আছে সেইটী এবং স্বনামখ্যাত আধুনিক ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'শ্রীকান্তে'র ১ম ভাগে শ্রীকান্তের শ্মশানে রাত্রি-যাপন অংশটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনটাই সত্য নয়। ভূত এ-পর্য্যন্ত কখনও দেখা যায় নাই; যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা কাল্পনিকমাত্র। এক্ষণে আমাদের শিক্ষাগুরু য়ুরোপ ও আমেরিকা এ-বিষয়ে কি বলেন দেখা যাক্। এতদিন তাঁহারা জড়বাদী ছিলেন, এক্ষণে ভূতবাদী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং Spiritualism লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিতেছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই এ-বিষয়ের যৎসামান্য উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এই সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব।

এই Spiritualism বস্তুটা কি? আমাদের গুরু য়ুরোপ এবং নবগুরু আমেরিকা এবং তাহাদের ভারতবর্ষীয় চেলারা যাহা বলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ইহা প্রাচীন ভারতে মুনিঋষিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল; যোগ, ন্যাস প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত এবং ইহা-দ্বারাই প্রাচীন মুনিঋষিগণ আত্মার উন্নতি করিতেন এবং আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেন। এ বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে, প্রাচীন Spiritualism যাহাই হউক্ না কেন, যেরূপ দেখা যায়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে আধুনিক Spiritualism এর লক্ষ্য কেবল পরলোকরহস্য উদ্ঘাটন করা। সুতরাং, ভূত-প্রেত লইয়াই আধুনিক

Spiritualismএর কারবার।

একটু ধীর-ভাবে ভাবিলে আধুনিক Spiritualismএর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। অশিক্ষিত লোকদিগের ভূতপ্রেত-সম্বন্ধে ধারণা অশিক্ষিতোচিত। তাহাদের ভূত-গণ সাধারণতঃ বৃক্ষে অথবা কোন অপরিষ্কার স্থানে থাকে; ওঝাই তাহাদের ভূত-চিকিৎসক; ওঝার 'সাপের মন্ত্র' ও সরিষা পড়াই তাহাদের অবলম্বন। আধুনিক Spiritualism জিনিশটা ঐ অশিক্ষিত লোকের ধারণাগুলিরই একটি বিলাতী ছাপ-মারা (Royal edition) রাজসংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য রাখিবার জন্যই Spiritualismএর উৎপত্তি। অশিক্ষিতের ওঝা শিক্ষিতের Medium এ পরিণত হইয়াছে; অশিক্ষিতের ওঝার মন্ত্র শিক্ষিতের Planchetএ পরিণত হইয়াছে; অশিক্ষিতের ভূতে পাওয়া শিক্ষিতের ভূত আনাতে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে, এই সব ব্যাপার জনকতক নিষ্কর্ম্মা লোকের সময় কাটাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ডি এল্ রায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছিলেন—'এমন সময়ে পড়ে গেলাম Theosophyর গর্ত্তে' ইত্যাদি।

এরূপ শুনা গিয়াছে, (নিজে দেখিবার সৌভাগ্য কখন ঘটে নাই) যে, Mediumএর উপর ভূতের আবির্ভাব হইলে সে অনেক অজ্ঞাত অতীতের কথা ও ভবিষ্যতের কথা বলে। ইহা হইতে কেহ কেহ ভাবেন যে ইহা ভূত দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং তজ্জন্য তাঁহারা ভূতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রথমতঃ এরূপ কোন লোক ভবিষ্যতের কথা বলিতেছে, ইহা কেবল শুনাই আছে, কখনও নিজে দেখি নাই; সুতরাং ইহা অবিশ্বাস্য। দ্বিতীয়তঃ, Mediumএর ভবিষ্যদ্‌বাণী অধিকাংশই মিলে না অর্থাৎ আন্দাজে যে-টা লাগিয়া যায় তাহাই সত্য বলিয়া গণ্য হয়। তৃতীয়তঃ, বাস্তবিকই যদি কোন Medium ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে পারেন, তাহা হইলে বিজ্ঞান তাহার অন্য কারণ দিয়াছে, ভূত তাহার কারণ নহে। নিম্নে সেই কারণ লিখিত হইল।

মনুষ্যের মনের অস্তিত্ব সকলেই মানেন্। এই মনের দ্বারা আমরা চিন্তা করি এবং যাহা কিছু ঘটে, তাহা স্মরণ রাখি। এই মনের দুইটা বিভাগ আছে—বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। বহির্বিভাগদ্বারা আমরা সর্ব্বদা চিন্তা করি এবং ইহা সর্ব্বদা আমাদের প্রত্যক্ষ থাকে। কিন্তু অন্তর্বিভাগের কোন খবরই আমরা রাখি না। ইহার অস্তিত্ব আমরা কচিৎ জানিতে পারি। কখন কখন জীবনে যাহা কখনও ভাবা হয় নাই, দেখা হয় নাই, কল্পনা করা হয় নাই, স্বপ্নে তাহা দেখা যায়। জলে ডোবা হইতে রক্ষা পাইয়াছে এরূপ কোন কোন ব্যক্তির মুখে শুনা গিয়াছে যে, মজ্জমান অবস্থায় জীবন-রক্ষার জন্য যখন সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তখন তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের যত স্মৃতি-পথারূঢ় এবং বিস্মৃত ঘটনাবলীর ছবি চলিয়া গেল। কখন কখন দেখা যায়, বহুকাল বিস্মৃত কোন এক কবিতা সহসা লাইনে লাইনে মনে পড়িয়া গেল। স্বপ্নাবস্থায় কেহ কেহ কবিতা রচনা করিয়া ফেলেন। এইসকল মনের অন্তর্বিভাগের কার্য্য। এই অন্তর্বিভাগের অস্তিত্ব বিজ্ঞান-সম্মত ও দর্শনশাস্ত্র-সম্মত। এই অন্তর্বিভাগের

ইংরাজী নাম Subliminal self। Subliminal self এর স্বরূপ কি, তাহার কার্য্যপ্রণালী কি-প্রকার, তাহার পরিধিই বা কতদূর—এ-সকল এখনও জানা যায় নাই। বিজ্ঞান বলেন যে,Subliminal selfকে কোনপ্রকারে উদ্বুদ্ধ করিয়া Mediumগণ ভূত ভবিষ্যৎ বলেন্। Mind-telepathyও এই Subliminal self এর সাহায্যে সাধিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে ভূতের কার্য্য-কলাপ কিছুই নাই। সুতরাং, ইহার জন্য ভূতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যাহা হউক্, এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার উপরেও আমার সবিশেষ আস্থা নাই। আমার বিশ্বাস, অপরের মনের কথা, ভূত-ভবিষ্যৎ, এমন কি নিজের ভবিষ্যৎও কেহ বলিতে পারে না; বড় জোর নিজের অতীত বলিতে পারেন, তাহার অধিক বলিবার শক্তি কাহারও নাই।

অনেক সময়ে একটী ত্রিকোণ টেবিলের তিন পার্শ্বে তিনজন লোক বসিয়া ভূত নামান্ অথবা প্লান্চেটের সাহায্যে ভূতের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন্। ইহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। প্লান্চেটে দেখা যায় যে, একটী মৃত ব্যক্তিকে বহু ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে তাহার ভূত প্লান্চেটে আবির্ভূত হয়। তখন তাহাকে যে-কোন প্রশ্ন করা যায়, প্লান্চেট নড়িয়া তাহার উত্তর লিখিত হইয়া যায়। ইহার কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকিতে পারে। হয় ত, এরূপ কিছু হইতে পারে যে, কাহারও বিষয়ে গভীর চিন্তা করিলে, আমাদের দেহে একপ্রকার অজ্ঞাত শক্তি (energy) উৎপন্ন হয়; সেই শক্তিই প্লানচেট্ নাড়ায়। অথবা দেহস্থ electricity গভীর চিন্তাদ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্লান্চেট নাড়ায়। প্লান্চেটে প্রশ্নের যাহা উত্তর পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মিলে না; সাধারণতঃ, কল্পনায় যাহা থাকে, তাহাই electricity অথবা অজ্ঞাতশক্তি-দ্বারা বহিঃপ্রকাশিত হয় মাত্র। ইহা দ্বারা বুঝা যায় প্লানচেট্ মনোরাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার; ভূতের সহিত ইহার লেশ-মাত্র সম্পর্ক নাই। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, পূর্ব্বের ন্যায় বিজ্ঞানসম্মত এই হেতু-নির্দ্দেশেও আমার বিশেষ আস্থা নাই। আমার বিশ্বাস, প্লানচেট যাঁহারা ধরিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ ইচ্ছা করিয়া প্লান্চেট নড়াইয়া উত্তর লেখেন। বলা বাহুল্য যে, বহুবার চেষ্টা করিয়াও আমি প্লান্চেটে ভূত নামান কার্য্যে একবারও কৃতকার্য্য হই নাই এবং কোন প্রশ্নেরও উত্তর পাই নাই।

তাহার পর ভূতের ফটো (Photo) উঠা। শুনিয়াছি যে, কোন মৃত ব্যক্তির ফটো তুলিয়া পরে দেখা গেল যে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাহার বহুপূর্ব্বে মৃত আত্মীয়-স্বজনের আকৃতি দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া আসিলেও Plate এর উপর ছায়াপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। ব্যাপারটা কতদূর সত্য জানি না; এরূপ কোন ফটোও দেখি নাই। তবে বোধ হয়, এ-সকল ক্যামেরার দোষ-জন্যই হয়; হয় ত প্লেট্ কোন কারণে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাতে আলোকের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা লোকেরই কয়েকটা বিকৃত মূর্ত্তি প্লেটে অঙ্কিত হইয়া যায়। সেই বিকৃত মূর্ত্তি-গুলিকেই সাধারণ্যে আত্মীয়-স্বজন বলিয়া পরিচিত করা হয়। মৃত ব্যক্তির দেহের সহিত তাহার মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার কি সম্বন্ধ

আছে, তাহা বুঝি না। যদি মৃত আত্মীয়-স্বজন সেই ব্যক্তিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে লইয়াই ত তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চলিয়া যাওয়া উচিত; মৃত্যুর বহুক্ষণ-পরে ফটো তুলিবার সময়-পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির জড় দেহের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহাদের জটলা করিবার অর্থ কি? ভূতগণও কি ফটো তুলাইবার লোভ সাম্‌লাইতে পারেন্ না?

অতঃপর Ectoplasm। যখন Medium গভীর চিন্তামগ্ন হয় এবং ভূতদ্বারা আবিষ্ট হয়, তখন তাহার দেহ হইতে একপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নির্গত হয়। এই পদার্থই মৃত ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই পদার্থের নাম Ectoplasm। এই Ectoplasm নির্গত হইবার পর Medium এর দেহের ভার প্রায় আধমণ কমিয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে, ইহা হইতে Hydrogen, Carbon ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। ইহা পোড়াইলে শিং-পোড়ার ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হয়। Medium এর গাত্র হইতে যখন ইহা বাহির হয়, তখন ইহাকে স্পর্শ করিলে ইহা চকিতের মধ্যে দেহের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া যায়; সুতরাং, ইহা অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন। ইহাকে ধরিয়া টানিলে Medium এর ক্লেশ হয় এবং সে চীৎকার করে। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, Protoplasm যেমন একরূপ পদার্থ, সেইরূপ Ectoplasmও একরূপ পদার্থ। গভীর চিন্তাতে ইহা প্রকাশিত হয় এবং যাহার দেহ হইতে বাহির হয়, তাহার কল্পনায় যে মূর্ত্তি আছে ইহা সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করে, অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে,এই Ectoplasm এখনও দেহস্থ অজ্ঞাত একপ্রকার পদার্থ এবং ইহার মূর্ত্তি-গ্রহণ কল্পনা-প্রভাবে ঘটে। ইহাতে ভূতের নাম-গন্ধও নাই। এই Ectoplasm আমি কখনও দেখি নাই, ইহার মূর্ত্তি-গ্রহণও কখনও পর্য্যবেক্ষণ করি নাই, এবং ভবিষ্যতে নিরীক্ষণ করিবার সৌভাগ্য কখনও হইবে কি না জানি না। মাসিকপত্রগুলিতে এ-সকল জিনিসের যেরূপ আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, এই Ectoplasm-নামক কোন পদার্থ সত্যই আছে; কিন্তু তথাপি ইহা যে প্রকৃতই আছে অথবা য়ুরোপের ও আমেরিকার বুজ্‌রুকগণ-দ্বারা কল্পিত Newspaper flam, সে-বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হই নাই।

অবশেষে দেখা যাইতেছে যে কোনপ্রকারেই ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ বলিয়া এতদিন যে ব্যাপারগুলি চলিয়া আসিতেছে, সকলগুলিরই একটা না একটা অন্য কারণ আছে। সুতরাং ভূতে বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। মৃত্যুর পর কি হয় জানি না, soul বলিয়া কোন কিছু আছে কি না জানি না; পরলোকের অস্তিত্ব আছে কি না জানি না; বোধ হয়, পৃথিবীর কেহই জানেন্ না। কিন্তু সাধারণতঃ পৃথিবীর ঘটনাবলীতে মৃতব্যক্তির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরলোক থাকিলেও পৃথিবীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই; পরলোকবাসীর পৃথিবীবাসীর উপর কিছুমাত্র হাত নাই। যে একবার মরিয়া

গিয়াছে, তাহার আর কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না। যতদিন আমরা পৃথিবীতে আছি, তত দিন পরলোক-সম্বন্ধীয় তিলমাত্র সংবাদ অথবা প্রমাণ আমরা পাই না। এক কথায় পরলোক থাক্ বা নাই থাক্, জীবিতাবস্থায় তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং, এ-দিক্ হইতে দেখিলে পরলোকে বিশ্বাস করা বা না করা উভয়ই সমান। বিশ্বাস করিলেও আমরা কিছুই জানিতে পারিব না, অবিশ্বাস করিলেও কিছুই জানিতে পারিব না।

কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ একটা আশ্রয়, একটা সান্ত্বনা পান, অন্ধের নয়নমণি, স্নেহের দুলাল, সমস্ত আদর ও সোহাগের পাত্র, একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে মাতা-পিতা যদি পরলোকে পুনরায় তাহাকে ফিরাইয়া পাইবেন এই আশায় আশান্বিত হইয়া বাকি কয়টা দিন পৃথিবীতে বিষদিগ্ধ দুর্ব্বহ জীবনভার আর্ত্ত-মথিত-হৃদয়ে কোনপ্রকারে বহন করিতে পারেন, বন্ধু যদি পরমপ্রেমাস্পদ, অভেদাত্মা, অত্যাগসহন-বন্ধুর মৃত্যুর পরে পরলোকে পুনরায় তাহার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় বিয়োগমার্ত্তণ্ড-তাপতপ্ত, হতাশাবালুকাকুলিত, দুঃখক্লেশমরীচিকাশ্রিত, ব্যাকুল, দগ্ধ তৃষিত জীবনসাহারায় ক্ষণিকের তরে অমৃতবিন্দু খুঁজিয়া পান্, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পরলোক-বিশ্বাসে বাধা দেওয়া কখনও মনুষ্যোচিত নহে।

শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতায় শিশু- ও জননী-মৃত্যু।—বিগত ইং ১৯২০ সালের বিবরণে কলিকাতার স্বাস্থ্যবিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ ক্রেক্ দেখাইয়াছেন যে, আলোচ্য বর্ষে প্রতি সহস্রে শিশু ও জননীর মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ৫০০৯ ও ৩৮৩ হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এরূপ অধিক শিশুমৃত্যু কখনও ঘটে নাই। তাঁহার মতে অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য, অত্যধিক জনতা, আহারের অপ্রাচুর্য্য, বাল্যবিবাহ ও রুদ্ধ গৃহে আবদ্ধ থাকাই এই মৃত্যুর কারণ এবং সহরবাসীদিগের নৈতিক চরিত্রের অবনতিও এই অসহায় শিশু ও জননীদিগের মৃত্যুর সংখ্যা বর্দ্ধনে দিনে দিনে সহায়তা করিয়াছে। এই দুরবস্থার কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞানালোক প্রচার, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও মুক্তবায়ু-সেবন করা নিতান্ত প্রয়োজন। দেশবাসীকে উদ্ধার না করিয়া স্বদেশের উদ্ধার অসম্ভব।

আগমনী-গান।

(ললিত)

ওগো আনন্দময়ি জননি!
চরণে তোমার প্রণমি!
তব প্রেমমুখে চাহিয়া
যাব সুখে গান গাহিয়া,—
বিপদ্ আপদ্ দুঃখ ক্লেশ
কোন বাধা নাহি গণি!
বহুদিন পরে জননি
এসেছ দীনের দ্বারে,—
লও হৃদয়ের পূজা উপহার
ভক্তি-কুসুম হারে!

থাক গেহ আলো করিয়া,
যেয়ো না—যেয়ো না সরিয়া,
প্রেমে—গানে প্রাণ ভরিয়া
বিতর প্রসাদ জননি!

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৮—নবেম্বর, ১৯২১।

সূচী

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারিআনা) মাত্র।
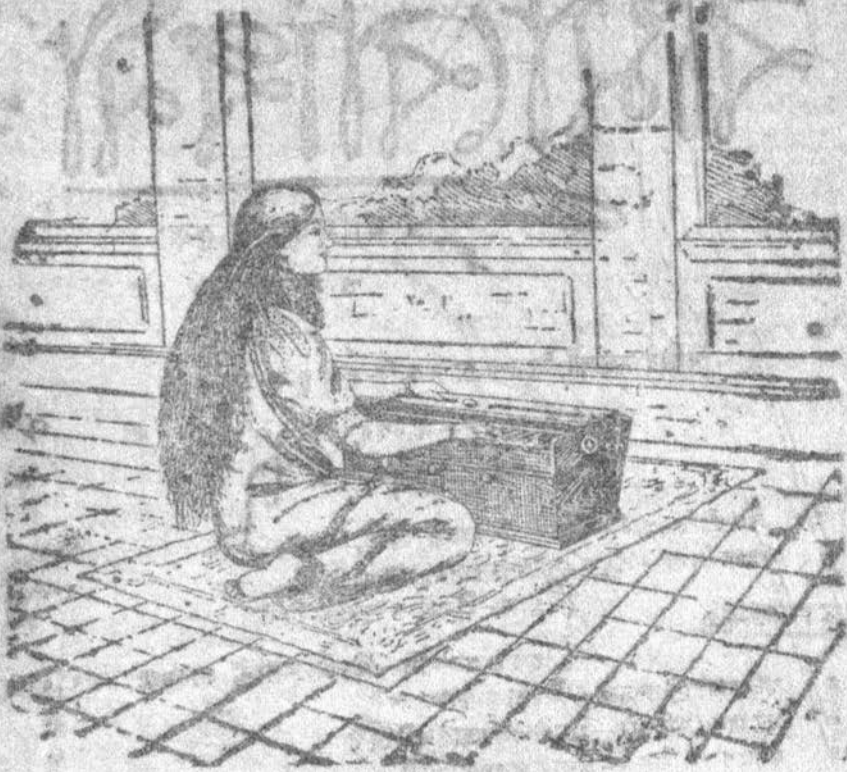
বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 699. November, 1921.

"কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৬৯৯ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৮। নবেম্বর, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

বিশ্ব-প্রীতি।

(মিশ্র পূরবী)

আহা! এই হাওয়াতে প্রাণে আমার
কি গান গায়!
গোপনে মোর মরম-মাঝে
কি শুনায়!
এই যে শ্যামল তৃণের রাশি
কি যে আমি ভালবাসি!
আহা! কাঁচা-সবুজ এমন হাসি
কে জাগায়!
ওগো মোহন, ওগো মধুর
এই তুমি—
সেজে এই ভুবন, দেহ,
মন চুমি'!

ফুলে ফুলে সন্ধ্যাকাশে,
রবি তারায় শশীর হাসে,
আহা! স্থলে জলে রূপ বিকাশে
কি শোভায়!
আমি যে আর পারি নে গো,
দে-গো আমায় ডুবিয়ে দে গো,
রাঙিয়ে দে মোর হিয়া-কায়া
ঐ আভায়!
নিখিল সনে মধুর হব,
পাব বঁধুর পরশ নব,
ভাসিয়ে দেব তরী হঠাৎ
অজানায়!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

শিশুর শিক্ষা।*

শিশুর শিক্ষা ও পেষ্টালট্‌সি।

(১৭৪৬—১৮২৭)

য়ুরোপীয় শিক্ষার ইতিহাসে পেষ্টালট্‌সির (Pestalozzi) প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর শিক্ষাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞানরূপে গঠন করিয়া তুলিতে যে-সকল মনীষী চেষ্টা করিয়াছেন, পেষ্টালট্‌সি তাঁহাদের পিতামহ। মানসিক-বৃত্তির বিকাশ- ও উন্মেষ-সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-গুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পেষ্টালট্‌সি এই পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রোবেল (Froebel), হার্ব্বার্ট (Herbart) ও হোরেস্ ম্যান (Horace Mann) সর্ব্বপ্রধান। পেষ্টালট্‌সি শিশুর শিক্ষার বিষয়- ও প্রণালী-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে শুধু তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।—

যখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন য়ুরোপের কোনও কোনও স্থানে শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে অনেক দোষ ও ত্রুটি ছিল। সেই সকল বিদ্যালয়ে শিশুদিগের মনোবৃত্তি-বিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। "ধর্ম্মশিক্ষা" "ধর্ম্মশিক্ষা" করিয়া লোকগুলি এত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গেই তাহারা 'বাইবেলের' মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। যদি 'ফুল'-সম্বন্ধে কোনও পাঠ প্রদান করিতে হইত, তবে বাইবেলের যেখানে লিখিত আছে যে 'মানুষ ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়া, আবার ঝরিয়া পড়ে', সে স্থলের উল্লেখ করিতে হইত; ইত্যাদি। ছাত্রেরা অর্থ বুঝুক্ বা না বুঝুক্, কার্য্য করুক্ বা না করুক্, বাইবেলের কথা মুখস্থ করিতে পারিলেই তাহাদের ধর্ম্মলাভ হইল—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের তাহারা বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল।

যেখানে বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইত, সেই বিদ্যালয়েও "অকালপক্ব শিশু" প্রস্তুত করিবার দিকেই লোকের ঝোঁক্ ছিল। যখন বিদ্যালয়ে পরিদর্শক উপস্থিত হইতেন, তখন শিক্ষকগণ তাঁহাদের সেই "অতি-বুদ্ধি শিশুর" অলৌকিকী শক্তি দেখাইয়া পরিদর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন্। ইহার বিষময় ফল এই হইত যে, সেই শিশুগুলির মধ্যে দিন দিন অহঙ্কারের ভাব প্রবল হইয়া উঠিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য শিশুগণের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহের ভাব উদিত হইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিত। এইরূপে অধিকাংশ শিশুই নিরুৎসাহ, নিরাশ ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া শিক্ষার প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িত।

---

* 'শিশু-শিক্ষার পথপ্রদর্শক'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তাহারই অনুবৃত্তি।

ভ্রমের ভিতর দিয়াই ভ্রম-নিরসনের শক্তি অর্জ্জিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের দোষ-ক্রটি দর্শন করিয়া শিশুশিক্ষা-প্রচারের পক্ষপাতী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে উক্ত শিক্ষাকে দোষ-ক্রটীহীন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।—কিরূপ নীতি, কিরূপ প্রণালী, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কৃতকার্য্যতা-লাভে সমর্থ হইবেন, তাহার আভাস বা সন্ধান তাঁহারা তথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তৎকালীন শিশু-বিদ্যালয়গুলির পক্ষে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, তথায় দয়া মায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তির উন্মেষসাধন ও নৈতিক-জীবন-গঠনের প্রচেষ্টা ছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদেরও একটু ব্যবস্থা ছিল। একটি শব্দেরও অর্থ না বুঝিয়া ল্যাটিন ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়া করিয়া বালকগণ উচ্চতর বিদ্যালয়ে যেরূপ সময় নষ্ট করিত, এই সকল শিশু-বিদ্যালয়ে অন্ততঃ সেইরূপটি হইত না। তথাপি শিশু-বিদ্যালয়-গুলি বালক-বিদ্যালয়ের অবিকল নকল বা প্রতিরূপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অধিক-বয়স্ক বালকদিগকে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রদান করিয়াই শিক্ষকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাধান করিতেন,—শুধু তাহাদের মনে জ্ঞানরাশি ঢালিয়া দিয়াই তাঁহারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও শিক্ষা-প্রদান-কালে শিশুদের কোমল বয়স বা কোমল মস্তিষ্ক কথা না ভাবিয়া, সেই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীই অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। "শিশু-শিক্ষার" যে নব আদর্শ ও প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া পেষ্টালট্‌সি ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ফ্রোবেল শিক্ষাক্ষেত্রে এক নব-যুগের সূচনা করিয়াছিলেন, উহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তখনও য়ুরোপ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই।

পেষ্টালট্‌সির শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী শিক্ষা-সংস্কারকগণ তদুপরি সুশোভন শিক্ষা-সৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্; এবং সেই উন্নত আদর্শে পৌছিবার যে সোপানাবলী তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অতি প্রকৃষ্ট। তিনি বলেন—"মানব-হৃদয়ে ভগবান্ যে-সকল বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন, অবাধ-ব্যবহার-দ্বারা তাহাদের পূর্ণ-বিকাশ-সাধনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। মানব যে অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, সে তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের যন্ত্র-স্বরূপ জ্ঞান করিবে এবং স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভগবদ্দত্ত শক্তির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া জীবনের পূর্ণ পরিণতি-লাভে সচেষ্ট হইবে। যে শিক্ষা মানবকে এই গুরুকর্ত্তব্য-সাধনের উপযুক্ত করিয়া তুলে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।" সুতরাং শুধু জ্ঞানদান বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য—শিশুর হৃদয়নিহিত ভগবদ্দত্ত শক্তির উন্মেষ-সাধন। উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, সকলের হৃদয়েই এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকগণও শিক্ষাগুণে তাহাদের সেই ভগবদ্দশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। তাই কৃষককুল যাহাতে সেই শক্তির সন্ধান পাইয়া উহার উন্মেষসাধনে যত্নপর হয়, তাহাই পেষ্টালট্‌সির জীবনে প্রধান ব্রত হইয়া উঠে, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

তাঁহার বিশ্বপ্রেম, তাঁহার স্নেহমমতা, তাঁহার কোমল-কঠোর শাসন শিশুদের হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন ও আশার তরঙ্গ তুলিয়া শিক্ষাকে সরস, সজীব ও প্রাণবান্ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনোবৃত্তির উন্মেষ-সাধন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য না হইলেও, উহা উদ্দেশ্য-লাভের উপায়ভূত শিক্ষার যে এক প্রধান অঙ্গ, এ-কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তবে তিনি বলেন—লিখন, পঠন ও গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ও হৃদয়ের উন্মেষ বিধান করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়া তাহার পক্ষে যত প্রয়োজনীয়। কাজেই শিশুকালে লেখাপড়ার দিকে সমস্ত মনোযোগ না রাখিয়া, শিশুর হস্তকৌশল ও বাক্-শক্তির চর্চ্চা-বিষয়ে পিতা মাতা ও শিক্ষকের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া উচিত। যে জ্ঞান কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার মূল্য অতিশয় অল্প। সুতরাং বিদ্যালয়ে গৃহ-শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান প্রদান করিয়া মৌখিক-শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করা উচিত। শিশুগণ যাহাতে লেখাপড়ার বাহাড়ম্বরের মোহে মুগ্ধ না হইয়া, নিজ নিজ অবস্থা ও বয়সের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রম- ও ধৈর্য্য-সহকারে ধীর-স্থির-চিত্তে অগ্রসর হইতে পারে, এবং তাহাদের কোমল চিত্তে শিশুকাল হইতেই যাহাতে জীবে প্রেম ও ভগবানে ভক্তির সুমহান্ আদর্শ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকরী শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই শিশুর হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি এবং বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে। "বৃক্ষের পক্ষে মূল যেরূপ শিশুর পক্ষে হৃদয়ের দুইটি গুণ—বিশ্বাস এবং ভক্তিও তদ্রূপ।" মূল ভিন্ন বৃক্ষের পক্ষে বর্দ্ধিত হওয়া যেরূপ অসম্ভব, হৃদয়ের বিকাশ ভিন্ন শিশুর অন্যান্য বৃত্তির উন্মেষ হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব। বস্তুতঃ, আমাদের হৃদয়-নিহিত কোমল ভাব—স্নেহ, প্রীতি, দয়া মায়া, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতিই আমাদিগকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করে; আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক সময় আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় সকল বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রত্যেক শিশুকে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা করিতে হইবে যে, কিরূপে সরল প্রাণে বিশ্বাস-ভক্তি-সহকারে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। কাজেই এক কথায় বলিতে গেলে, পেষ্টালট্‌সির মতে আদ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিশুকে প্রার্থনা, চিন্তা, ও কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া (—to pray, to think and to work)।

হৃদয়ের বৃত্তির পরিচালনা এবং মস্তিষ্কের পরিচালনার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনাও আবশ্যক। শিশু নীচবংশে শ্রমজীবীর ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক্, বা উচ্চবংশে সম্ভ্রান্ত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার শরীর-চালনা প্রয়োজনীয়। সুতরাং, বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, সকল শিশুকেই যেন কোন না কোনরূপ হাতের কাজ শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে শ্রমশীলতা ও আত্মশক্তির উন্মেষ হয়, অহঙ্কার বিদূরিত হইয়া আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত হয় এবং ভবিষ্যৎকালের কর্ম্মময় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগকে যে শিক্ষাই প্রদান করা হউক না কেন, তাহা সরল, সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথম ও প্রধান বিষয় ঠিক্‌ভাবে দেখিতে ও শুনিতে শিক্ষা দেওয়া এবং মনঃসংযোগ করিবার অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়া। তাই পেষ্টালট্‌সির প্রধান শিক্ষা-মত এই যে, শিশুগণ যাহা নিজে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে, সেই সকল পদার্থ লইয়া শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। তিনি বলেন—"শিশুদের ইন্দ্রিয়ের উপর সাধারণতঃ যাহা অতিসহজে আঘাত করে, সেই সকল পদার্থের প্রতিই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। শিশু সর্ব্বপ্রথম কখন্ শিক্ষালাভের শক্তি অর্জ্জন করে, এ-বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জন্ম হইতেই শিশুগণ শিক্ষালাভের শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। যেই মুহূর্ত্তে শিশুর ইন্দ্রিয় বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রকৃতিদেবী তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যে জীবনীশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তাহা এখন জাগ্রৎ হয়; তাহা এখন নব নব অনুভূতিকে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ শক্তির যথোচিত পরিচালনা করিয়া তাহাদের আধার-ভূত যে প্রাণবান্ যন্ত্র বা জীব তাহার পরিপুষ্টি ও উন্মেষের সহায়তা করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করিয়া তুলে। সুতরাং, শিক্ষকদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশের পথে সহজ- ও সরল-ভাবে সহায়তা প্রদান করা এবং তাহার বয়সের ও শক্তির তারতম্যানুসারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থসমূহ তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা।"

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর বর্ণনা-কালে তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করেন—"আমি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে চাই।" সমস্ত শিক্ষাকে তিনি "Anschauung" *—এই মূল ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। মনের যে শক্তির প্রভাবে মানব অপরের সাহায্য ভিন্ন অনায়াসে ও নিঃসংশয়িত-রূপে বাস্তব-জগৎ-সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, তাহাকেই "Anschauung" বলা যাইতে পারে। মুহূর্ত্তমধ্যে কোনও বস্তু- বা ব্যক্তি-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই "Anschauung।" ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-সম্বন্ধে উপলব্ধি—এই দুই-ই ইহার অন্তর্গত। সুতরাং প্রকার-ভেদে ইহাকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে:—ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি (Sensuous), বুদ্ধি-প্রসূত উপলব্ধি (intellectual), এবং বিবেক-জাত জ্ঞান (moral)। অথবা ইহাকে মোটামুটি দুই প্রকারের ধরা যাইতে পারে:—বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতি বা অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপলব্ধি। অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপলব্ধিকে আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—সত্যের জ্ঞান, সৌন্দর্য্যের জ্ঞান, মঙ্গলের জ্ঞান, এবং অসীমের জ্ঞান, এক কথায় সত্য, শিব, সুন্দর ও অসীমের জ্ঞান।

জ্ঞানই শিক্ষার মূলে নিহিত। লক্

---

* এই জার্ম্মাণ শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে, উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ এখনও ইংরাজী ভাষায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে ইংরাজীতে "Sense-impression," কেহ কেহ ইহাকে "Observation," কেহ কেহ বা "Intuition" বলিতে চান।

(Locke) পেষ্টালট্‌সির প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে জ্ঞান মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অনুভূতিমাত্র (Knowledge is the internal preception of the mind)। উপলব্ধি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু এই শক্তি শিশুদের নাই,—শিশুরা এইরূপ জ্ঞানলাভে অসমর্থ।—ইহাই লকের অভিমত ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষা-সংস্কারক রুসোও (Rousseau) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালকের কোনওরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা পছন্দ করেন নাই। কিন্তু পেষ্টালট্‌সি বলিলেন যে, প্রত্যেক শিশু জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করে। শিশু কি-ভাবে শিক্ষা করে? অপরের মনের চিন্তা বা ভাব বা অভিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক বাক্য আবৃত্তি করিয়া নয়, কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে, নিজের চিন্তাশক্তির প্রভাবে, নিজের ভাব-প্রবণতার (Feelings) গুণে সে শিক্ষালাভ করিতে থাকে।

সুতরাং, মনোবৃত্তির উন্মেষের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, আদ্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন। পেষ্টালট্‌সির মতে শিশুর এই চিন্তাশক্তি-বিকাশের প্রধান অবলম্বন — তাহার পরিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার জীবনের বাস্তবরাজ্য যাহা তাহার হৃদয়ে কৌতূহল, আগ্রহ, আমোদ প্রভৃতি ভাব জাগাইয়া তুলে। এক কথায়, যাহা হইতে তাহার প্রাণে স্পন্দন অনুভূত হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহ। শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য— শুধু শিশুর সম্মুখে উপযুক্ত পদার্থ উপস্থাপিত করা ও সেই সকল পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথোপযুক্ত সুযোগ শিশুকে প্রদান করা এবং পর্য্যবেক্ষণ-কালে স্নেহপূর্ণ অন্তরে শিশুর কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা ও তাহাকে কিছু কিছু সাহায্য করা। এইরূপে শিশুগণ যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহাই তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান; কারণ, এই জ্ঞান তাহারা নিজের বাহ্যেন্দ্রিয় ও নিজের অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিয়াছে।

যাহা হউক্, এই জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপারে জননী শিশুকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, এ পৃথিবীতে অপর কেহ তদ্রূপ পারেন্ কি-না সন্দেহ। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষিত হইলেও তাঁহারা মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা হইতে বঞ্চিত। অথচ মানবশিশুর শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সদয় ব্যবহার, সস্নেহ যত্ন, সকরুণ দৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার যত প্রয়োজন, আর কিছুরই তত আবশ্যকতা নাই। পেষ্টালট্‌সির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ শিক্ষাকার্য্য জননীগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে যেরূপ সুফলের আশা করা যায়, শিক্ষকের হস্তে তাহা অর্পিত থাকিলে সেরূপ সুফলের আশা দুরাশামাত্র। তাই শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি যে-আবেদন-পত্র প্রচার করেন, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যদ্ বংশধরগণ যাহাতে তাহাদের জননীর নিকট হইতে মানসিক উৎকর্ষবিধানের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইদিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পেষ্টালট্‌সি শিশু-জননীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"শিশুজীবনের বিকাশকার্য্যে

সর্ব্বপ্রধান সহায়ক হইবার উপযুক্ত সমস্ত গুণ দিয়া ভগবান্ মাতৃহৃদয় গঠন করিয়াছেন্। জননীর নিকট হইতে এরূপ আশা করা অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক হইবে না যে, তিনি স্নেহান্ধ না হইয়া একটু সুবিবেচনার সহিত তাঁহার সন্তানকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিবেন্।···ভগবান্ শিশুকে মানব-প্রকৃতির সমস্ত বৃত্তিই দান করিয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বপ্রধান বিষয় এখনও অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। কিরূপে উহার চিত্তবৃত্তি (heart), উহার বুদ্ধিবৃত্তি (head) ও উহার কর্ম্মশক্তির (hand) চালনা করিতে হইবে, তাহা এখনও একটি প্রধান শিক্ষা-সমস্যাই আছে। কাহার সেবায় তাহার দেহ-মনঃ-প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইবে, তাহা এখনও রহস্যের গূঢ় জালেই আচ্ছন্ন রহিয়াছে। হে শিশু-জননি! তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ এই প্রশ্নের-সুমীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। তোমার সন্তানের সম্মুখে স্বর্গারোহণের সোপানাবলী উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই সোপানাবলীর সাহায্যে কিরূপে স্বর্গে আরোহণ করিতে হইবে তাহাই শুধু তোমাকে শিক্ষা দিতে হইবে। সাবধান। তোমার সন্তান যেন শুধু মস্তিষ্কের অসার শক্তির সাহায্য অথবা শুধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় ভাবতরঙ্গের সহায়তায় সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে চেষ্টা না করে। শরীর মন ও হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলিকে একীকৃত, সমঞ্জসীভূত ও পূর্ন-বিকশিত করিতে চেষ্টা কর, তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ গৌরব-মণ্ডিত, মহিমময় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।”

সন্তান-বৎসল শিক্ষিত বঙ্গজননীগণ! তোমাদের সম্মুখে প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। সন্তানের প্রথম শিক্ষার ভার তোমাদিগকে নিজ-হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উদার শিক্ষার অভাবেই তোমাদের সন্তানগণের হৃদয় সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। তাই সে-দিন বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনাধিকার-ব্যাপারে তোমাদিগকে এতদূর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইল। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ বলিয়াছেন—‘সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন-দ্বারা চির দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম আমাদের মাতৃভূমি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।’ আমরা ভুলিয়া যাই যে, “সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজের সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়মে এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর ও যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহার করা উচিত।” অতএব যে শিক্ষায় ‘মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সহানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই,’ সেই শিক্ষার মূলোৎপাটন করিয়া, হে বঙ্গজননীগণ-তৎস্থলে সন্তানের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত কর। যে শিক্ষায় ‘হৃদয়ের মেঘ কখনও কাটে না, এ অবস্থা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি-না মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎ-

সাহের অভাবে তাহা মনেই বিলীন হইয়া যায়', সেই শিক্ষার বিনাশ সাধন করিয়া সন্তানের উদার ও উন্নত শিক্ষার আয়োজন কর। দেখিবে অচিরে নারীর মর্য্যাদা ফিরিয়া আসিবে, সমাজের মুখ হইতে কলঙ্ক-কালিমা অপসৃত হইবে এবং ভারতের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। তাই পেষ্টালট্‌সির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"Then why resign into a stranger's hand
A task as much within your own command,
That God and Nature and feeling too
Seem with one voice to delegate to you?"

[অর্থাৎ— বিধাতা, প্রকৃতি আর আত্মভাব যাহা
সমস্বরে সাধিবারে ডাকিছে তোমায়,
যে-কার্য্য সাধিতে তুমি নিজেই সবল,
পর হস্তে কেন তবে তুলি দাও তাহা ?]

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত।

বিসর্জ্জনী।

নন্দন আনন্দ-আভা ছড়াইয়ে দিয়ে,
দাঁড়াইলে মা আমার কুটীরে আসিয়ে!
আজি বিদায়ের দিন, হাসি, আলো, বজ্রলীন,
নিবিড় তিমির শুধু চমকে ঘনিয়ে।

প্রাণ করে হাহাকার। যাবে তুমি দূরে—।
ভুলে যাই, যথা রহ দূরান্তর পুরে,—
অশ্রু বাষ্প বাহি স্মৃতি পহুঁছিবে পদে নিতি—
ভকতের মনোরক্ত- জবা ডালি নিয়ে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত * ——একতালা।

০ ১ ২´ ৩
II । ন্‌া -ঋা ঋা । মা মা -া I মমা মজ্ঞা -মা । মা গা -া ।
ন ন্‌ দ ন আ ০ নন্‌ দ০ ০ আ ভা ০

০ ১ ২ ৩
। মা পা -া । মা পা -দা I দা পা -া । -া -পা -া ।
ছ ড়া ০ ই য়ে ০ দি য়ে ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। মা গা মা । পা -দা -া I পা -দা পা । পা -া -া ।
দাঁ ড়া ই লে ০ ০ মা ০ আ মা ০ র্‌

---

* ললিত, ভৈরোঁ এবং বিভাস মিশ্রিত।

০ ১ ২´ ৩
। মা গা পা । মা -া -া I গা -মা গা । ঋা -সা -া } ।
কু টী রে আ ০ ০ সি ০ রে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা ন্া -া । সা গা -া I ঋা -া সা । সা -া -া ।
আ জি ০ বি দা ০ রে ০ র দি ০ ন্

০ ১ ২´ ৩
। সা রা -া । মা মা -া I মা মা -পা । মা গা -া ।
হা সি ০ আ লো ০ ব স্ত্র ০ লী ন্ ০

০ ১ ২´ ৩
। মা গা গা । মা ধা ধা I পা পা -া । -মা -গা -া ।
নি বি ড় তি মি র ও ধু ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । -া -া -া I ঋা ঋা -া । সা -া -া II
চ ম কে ০ ০ ০ ধ নি ০ রে ০ ০

অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
II { ধা -পা -া । গা পা -া I ধা র্সা -া । র্সা -া -া ।
প্রা ণ্ ০ ক রে ০ হা হা ০ কা ০ র্

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্ঋা র্ঋা । র্ঋা -র্সা -না I র্সা র্সা -া । -া -া -া } ।
যা বে তু মি ০ ০ দূ রে ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। পা র্সা র্সর্সা । -া -া -া I না র্সা -না । দা পা -া ।
ভু লে যাই ০ ০ ০ য থা ০ র হ ০

০ ১ ২´ ৩
। মা গা -পা । দা পা -া I গা মা -গা । -ঋা -সা -া II
দূ রা ন্ ত র ০ পু রে ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II { সা ঋঋা সা । -া সা -া I সা ঋা -গমা । মমা মা -া ।
অ শ্রু বা র্ প ০ বা হি ০ স্মৃ তি ০

০			১			২́			৩		
। মা	গা	মা ।	ধা	-া	-া I	পা	ধা	-পা-া ।	মা	মা	-গা } ।
প	হঁ	ছি	বে	০	০	প	জে	০	নি	ডি	০

০			১			২́			৩		
। পা	ধা	র্সা ।	র্সা	-া	-া I	না	র্সা	-না ।	-র্দা	-পা	-া ।
ভ	ক	ভে	র	০	০	র	নো	০	০	০	০

০			১			২́			৩		
। মা	-ণণা	দা ।	পা	-মা	-গা I	মা	পা	মা ।	গা	-ঋা	-সা II II
র	কৃত০	জ	বা	০	০	ডা	লি	নি	য়ে	০	০

স্মৃতিহারা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৪)

অল্পদিন পরে কোহিনুরের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সরোজা তাহার নাম দিলেন 'নবনুর'।

বিনোদ পুত্রের জন্মের সংবাদ পাইয়া আসিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সঙ্গীরা ছাড়িল না; বলিল, "ব্রহ্মদেশটা ভাল করে না দেখে যাচ্ছি না। ছেলে তো পালাচে না।—দু'দিন পরেই না হয় দেখ্‌বে।"

কোহিনুর এতদিন স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিত বটে; কিন্তু যে-দিন হইতে নবনুর তাহার কোল আলো করিল, সে-দিন হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই সে স্বামীর আগমনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইতে লাগিল। তাহাদের দুই জনের কত সাধের কত আশার সন্তান! এই ভাবী অতিথির আগমন-সূচনায় দুইজনে কত মধুর কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে, কত নিত্য নূতন সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। আজ সেই ধন তাহার কোলে আসিয়াছে! এ-সুখের ভার কি সে একা বহনে সমর্থ! এই হাসি শিশুর এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য,যাহা অহর্নিশ নেত্র দ্বারা পান করিয়াও দর্শনতৃষ্ণা মিটিতেছে না, সেই সৌন্দর্য্য সে কাহার নয়নে ঢালিয়া দিয়া বিভোর হইয়া দেখিবে! কবে কোহিনুর তাহাদের প্রতিচ্ছবি এই সন্তানকে সেই কোলে দিয়া জননীর গর্ব্বোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া নিজের নারীজন্ম সার্থক করিবে! তাহার অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশ হইতে নিরন্তর এই বাণী উত্থিত হইতে লাগিল—'এস প্রিয়, তোমার দাসীর এই অতিসুখের দিনে কি তোমার দূরে থাকা সাজে!'

কোহিনুর বিনোদকে পত্র লিখিল—"আমি না হয় তোমার অনাদরের হ'তে পারি, কিন্তু খোকা কি দোষ করল? তুমি আজও তা'কে দেখ্‌তে আস্‌লে না? সে বোকা ছেলে হয় তো এমন নিষ্ঠুরকে দেখেও হাস্‌বে; কিন্তু জেনে রেখ, আমি আর কথা কব না।"

ইহার উত্তরে বিনোদ হৃদয়ের আকুল আবেগ জানাইয়া পত্র দিল, কোহিনুরের কাছে শতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, সে যে তাহাদের দেখিবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে পত্রের ছত্রে ছত্রে বার বার করিয়া তাহা জানাইতে ভুলিল না।

বিনোদ দূরে থাকিয়াও রোজই জানিতে লাগিল, খোকা দিন দিন কেমন হইতেছে, কেমন হাসে, কখন্ কাঁদে, ইত্যাদি। খোকা যখন এক মাসের হইল, তখন পিতা ও পিতামহের নিকট তাহার হাস্তময় প্রতিবিম্ব গিয়া স্নেহ-চুম্বনের দাবি করিয়া দাঁড়াইল। বিনোদ এবার আর পরিল না; সে গৃহ-পথ যাত্রী হইয়া পড়িল। কিন্তু এখানে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র বিনোদ টেলিগ্রাম পাইল,—তাহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত, তাহাকে অবিলম্বে তথায় যাইতে হইবে। সুতরাং শ্বশুরকে এই সংবাদ জানাইয়া বিনোদ কাশ্মীর চলিয়া গেল।

* * * *

কার্ত্তিকের প্রথমে সরোজা বলিলেন, "কোহিনুর, একদিন গরম জামাগুলা বাহির করিয়া রোদে দে না মা! ও-গুলা ভাল করে না ঝাড়া-ঝুড়া হ'লে তো গায়ে দেওয়া যাইবে না। আমার দ্বারা তো ও-সব হবার যো-ই নাই!"

গত পীড়ার পর হইতে সরোজার বুক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য পরিশ্রমেই তিনি হাঁপাইয়া পড়িতেন। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, হঠাৎ হার্টফেল হওয়ায় সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁকে যেন খুব সাবধানে রাখা হয়। মাতার আদেশ পাইয়া কোহিনুর বলিল, "তুমি খোকাকে দেখ মা, আমি সে-সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো।"

এই সময় খোকা তাহার মায়ের গলার হার ধরিয়া টানিয়া খেলা করিতেছিল; কোহিনুর বলিল, 'দেখ্‌চ মা, আমার হার কেড়ে নিচ্ছে?' সরোজা বলিলেন, 'তাই তো, আমারই অন্যায়! আমার এতদিন ওকে হার পরান উচিত ছিল তো! দাঁড়া, তোর ছোট-বেলার হারছড়াটা আর বালাটা বের করে আনি।"

গহনার জন্য সরোজা বাক্স খুলিলেন। গহনার বাক্স খুলিলেই সুশীলের ছবিখানি দেখা তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! সেই অভ্যাসানুসারে তিনি ছবিখানি দেখিতে গিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন—'ছবি কি হইল!' শেষে ধীরে ধীরে মনে হইল—"অসুখের সময় বিছানার তলায় রাখিয়া আর তো তুলি নাই!" তখন যে চাকর তাঁহার ঘরে কাজ করিত, তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অসুখের সময় বিছানায় একখান ফটো ছিল, দেখেছিস্?"

সে কোহিনুরকে ছবিখানি লইতে দেখিয়াছিল; বলিল, "দিদিমণি রেখেছেন।" সরোজা আত্ম-বিস্মৃত-প্রায় হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"দিদিমণি রেখেছে কি রে! সে যে আমার সুশীলের ছবি!" সরোজার ভাব দেখিয়া ভৃত্য থতমত খাইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কোহিনুর পাশের ঘরেই ছিল, সরোজার কথা সবই তাহার কানে গিয়াছিল। সে সরোজার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি খুঁজ্‌ছ মা?" কিন্তু মায়ের মুখের চেহারা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে জল আনিতে বলিল ও নিজে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

জল ও বাতাস দিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কোহিনুর মাতাকে শয্যায় লইয়া শোয়াইয়া দিল। সরোজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা ভগবান্!" কোহিনুর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে ছবি রেখেছি, তাতে তুমি কেন এমন অধৈর্য্য হ'লে মা? সুশীলের ছবি বলছ, তা আমার তা দেখ্‌লে কি হয়? তুমি আমায় কোন কথা বল না, কিন্তু এই সুশীল কে তা জান্‌বার জন্যে আমার মনে যে কি রকম একটা ঔৎসুক্য আসে, তা তোমায় কি বলবো! সুশীল বল্লেই যেন একটা কি-রকম গোল-মেলে স্বপনের মত মনের মধ্যে তোল-পাড় করে উঠে, অথচ আমি নিজে তার কোন মীমাংসা করতে পারি নে! তোমায় জিজ্ঞেস্ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তুমি নাম শুনলেই কি রকম হয়ে যাও! আমার ভারী আশ্চার্য্য মনে হয়!"

সরোজা কিছুক্ষণ কোহিনুরের মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কোহিনুর, তোর মা'র আর বেশীদিন আয়ু নেই; যে কথা তোকে নিজ হতে বলি নি, সে কথা বলতে বাধ্য করে তার প্রাণে আর ব্যথা দিস্ নে! কোথায় সে ছবি রথেছিস্ এনে দে; আমি মরণ-কালে যদি পারি, বলে যাব সুশীল আমার কে!"

কোহিনুর রাগ করিয়া বলিল, "আমার শুন্‌বার কোন দরকার নেই; তোমার ছবি এনে দিচ্ছি!" কোহিনুর জননীর হাতে ছবি ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সরোজা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মণিমোহন আসিয়া সরোজার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজা ফটো বাহির করিয়া বলিলেন, "কোহিনুরের কাছে ছিল। সে সুশীল কে জান্‌বার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। আমি বলি নি বলে সে রাগ করে আমার কাছ থেকে চলে গেছে।" মণিমোহন বলিলেন, "তোমারই অন্যায় হয়েছে। ও-রকম করে ওকে লুকুলে ওর মনে সন্দেহ আসবে। যত তুমি গোপন করবে ততই ওর মনে ওই কথা তোলাপাড়া করবে; শেষে ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ হয় তো সব মনে পড়ে যেতে পারে। আমি আর পারি নে। আমি তাকে যা'হোক বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

মণিমোহন কক্ষান্তরে গিয়া কোহিনুরকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিলেন। তিনি তাহাকে তাহার মাতার কক্ষে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "মা, তুমি সুশীল কে জানতে চেয়েছ? তোমার হতভাগ্য এই জনক-জননী পিতৃ-মাতৃহীন এই সুশীলকে পুত্রস্থানীয় করে প্রতি-পালন করেছিলেন। কিন্তু হায়, সে আমাদের ফেলে চলে গেল! তুমি তখন অতিবালিকা। আমি তোমার মাকে বলে দিই, আমার বাড়ীতে যেন তার নাম, তার প্রসঙ্গ কেউ কখনো উত্থাপন না করে। তোমার মা কিন্তু তাঁর মমত্ব বিসর্জ্জন দিতে না পেরে মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে তার ফটো নিয়ে কাঁদতেন।" মণিমোহনের কথা শেষ না হইতেই শোকোদ্বেল-হৃদয়া সরোজা চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছা যাইলেন।

(১০)

এবারেও সরোজার সুস্থ হইতে দিন-আট-দশ লাগিল। কোহিনুর এত দিন রুগ্না মাতা ও শিশু পুত্রকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংসারের অন্য কাজের সময় ছিল

না। আটদশদিনের পরে আজ দুপুর বেলায় অবসর পাইয়া মায়ের কাছে সে খোকাকে রাখিয়া পুনরায় সেই গরম জামাগুলি সব রৌদ্রে দিল।

পিতার ভাল জামাগুলি ব্রুস দিয়া ঝাড়িয়া সে তুলিতে যাইতেছে, হঠাৎ একটা জামার পকেট হইতে একখান টেলিগ্রামের খোলা খাম পড়িয়া গেল। কোহিনুর সেটা কুড়াইয়া লইয়া ভিতর হইতে কাগজখানা টানিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল; পড়িয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল। এ কি! সে-ই যে তাহার পিতাকে ডাক্তার লইয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিতেছে—তাহার স্বামী পীড়িত! কোহিনুর অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি কাণ্ড! তাহার বিবাহিত জীবনের এই তো সবে দুই বৎসর--মাত্র দুইবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে! এই দুইবৎসরের প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহার অন্তরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সে পিতাকে স্বামীর অসুখের জন্য টেলিগ্রাম করিল কবে? কিন্তু করিয়াছে যে ইহাও সত্য। তবে এ টেলিগ্রাম বিজয়পুর হইতে করা হইয়াছে। কোহিনুর বিজয়পুরে কবে গেল! বিবাহের পর বিনোদের সহিত সে তো কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও যায় নাই! তবে একি প্রহেলিকা! কোহিনুর অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবিল, তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু গভীরভাবে ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনের বহুদিনের রুদ্ধকপাট মুক্ত হইয়া গেল। নিশাশেষে গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে যেমন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অরুণ-রাগ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বিস্মৃতির অন্ধকার-যবনিকা সজোরে অপসারিত করিয়া লুপ্ত পূর্ব্বস্মৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কোহিনুরের মনে রূপে প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া সুশীলের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

কোহিনুরের এতদিনের দারুণ ঔৎসুক্যের অবসানে সে জানিতে পারিল—সুশীল কে? তখন সে ভাবিতে লাগিল—ওঃ তাই সে-ছবি মা'র এত প্রিয়! কিন্তু কোহিনুরেরও তো সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই একমাত্র আরাধ্য ছিল! তবে আজ একি পরিবর্ত্তন! কোন্ যাদুকরের কুহক-মন্ত্রে কোহিনুর তাহার জীবনাধিককে একেবারে বিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছে! শুধু বিস্মৃত! কোহিনুর আজ বিনোদের স্ত্রী! নবদুরের মা! তাহাদেরই স্নেহ-প্রেমে আত্মহারা!—কি সর্ব্বনাশ! কোহিনুর আজ তাহার স্বামীর কাছে বিশ্বাসঘাতী! যে সতীত্ব গৌরবে সে সব দুঃখ সহিয়াছিল, তার সে রত্নও তো আজ অপহৃত! একি দুর্ভাগ্য! কোহিনুর ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এমন হইল? সুশীলের মৃত্যুর পর হইতে সে এক একটি ঘটনা ধীরে ধীরে স্মরণে আনিতে লাগিল।—পিতার সহিত আগমন, তাহার পর মায়ের অসুখ, তৎপরে শুধু স্বামীর চিন্তামাত্র অবলম্বন করিয়া দিন অতিবাহিত করা, তারপর নিজের পীড়ার কথার স্মরণ;—তারপরে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে একরাত্রে হঠাৎ সুশীল আসিয়া দেখা দিল! কই তার পর আর তো—আর ত কিছু মনে হয় না। সেই ঘটনার পর যে স্মৃতি তাহাতে ত সুশীল নাই। কোহিনুরের সে সাধনার জীবনও ত আর নাই। এ

একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগ! কি করিয়া এমন হইল? কোহিনুর শেষে সিদ্ধান্ত করিল সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে সে সুশীলকে দেখিয়া ছিল, সেই রাত্রি হইতে অত্যন্ত রোগ ও শোকের প্রাবল্যে তাহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই মুগ্ধ অবস্থায় তাহার এ-কি সর্ব্বনাশ হইল যে, যে-প্রাণ যে-হৃদয় জনমের মত সে সুশীলকে দিয়াছিল, তাহাই লইয়া সে আবার বিনোদকে সমর্পণ করিয়াছে। সে না হয়, সব ভুলিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতাপিতার তো সবই স্মরণে ছিল। তাঁহাদের চির-হতভাগিনীর এই দারুণ অভাগ্যের দিনে তাঁহারাও তাহাকে শত বন্ধনের—শত মোহ-অজ্ঞানতার পথে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়াছেন্! আজ যে কোহিনুরের স্বর্গ ও জগৎ দুই-ই অন্ধকার! সুশীলের কাছে আজ কি কঠিন অপরাধই না সে করিয়াছে! সুশীলের চরণে উৎসর্গীকৃত জীবনকে যে আজ কাহার পায়ে তুলিয়া দিয়াছে! তাহার চির-স্মরণীয়কে ভুলিয়া আজ কোহিনুর কাহাকে নিজের ইষ্ট গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে! কাহার সন্তানকে গর্ভে ধরিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ মনে করিতেছিল!! আর তাহার প্রেমের আরাধ্য দেবতা সুশীল স্বর্গে বসিয়া তাহার এই কার্য্য দেখিতেছে!!! কোহিনুর বার বার বলিতে লাগিল—"পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। এ কলঙ্কিনীর আর জগতে মুখ দেখাইবার স্থান নাই।"

কোহিনুর যখন এইরূপে আপনার জীবনকে শত ধিক্কার দিতে দিতে তীব্র অনুশোচনায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল, তখন সে যেন কাহার মৃদু শান্তিময় স্পর্শ অনুভব করিল! সে যেন গভীর সান্ত্বনা-মিশ্রিত বজ্র-গম্ভীর স্বরে কোহিনুরকে বলিতে লাগিল —'এই মর্ত্ত্যলোকের নরনারী যে অপরাধে অপরাধী তুমিও সেইরূপ অপরাধিনী। কোন বিশিষ্ট অপরাধ তোমার নাই। জগতের জীব যখন শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, তখন তোমার নিকটও সে দ্বার রুদ্ধ থাকিবে না। পাইবে পাইবে— চির শান্তি। দেখ, তাবৎ চরাচরের একমাত্র স্বামী যিনি, নরনারী তাঁহাকেই তাহাদের একমাত্র পরমপতি—একমাত্র গতি জানিয়াও বিস্মৃত ও বিমূঢ়ের ন্যায় কাম, ক্রোধ লোভ, প্রভৃতি রিপুকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহাদের প্রেমে আপনাদিগকে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছে। এই সকল রিপুর সংসর্গে ও সেবায় তাহারা কত চিন্তা ও কত অপরূপ কার্য্যের জন্ম দিতেছে এবং তাহাতেই যেন পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছে! একটি বারও তাহাদিগের জীবন স্বামীকে স্মরণ করিবার অবসর হয় না! কিন্তু ঐ আজিকার দিনের ন্যায়, যে দিন হঠাৎ—হঠাৎ—আচম্বিতে তাহাদিগের এ মোহের ঘোর কাটিয়া যাইবে, স্বকৃত এই বিস্মৃতির যবনিকা অপসারিত হইবে, সে-দিন আর তাহারা তাহাদের ঘৃণ্য জীবনভার বহন করিতে পারিবে না; সেই জীবনস্বামীর চরণে লীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। আর সে মোহজ ক্রিয়াকলাপ, কাল্পনিক প্রীতির আকুলি বিকুলি শ্রবণে প্রবেশ করিবে না।'

কোহিনুর যখন এইরূপ মনোময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, তখন সরোজা তাহার কিছুই জানেন না। বহুক্ষণ পরে তিনি

তাঁহার কক্ষ হইতে ডাকিলেন, 'কোহিনুর, তোর এখনও হয় নি রে ? খোকার যে খিদে পেয়েছে।' কোহিনুর কোন সাড়া দিল না। খোকার কান্নার স্বর ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল। সরোজা আবার স্নেহকোমল-স্বরে ডাকিলেন —'এ কোহিনুর !—এমন মাও তো দেখি নি বাপু! ছেলে কাঁদ্‌লে পোয়াতি এমন নিশ্চিন্ত থাকে ! আয় মা মা ! ছেলে ঠাণ্ডা ক'রে যা কর্‌বার কর।' তবুও কোহিনুরের কোন উত্তর নাই। সরোজা ভাবিলেন, তবে হয়তো কোহিনুর কার্য্যান্তরে গিয়াছে। দাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "কোহিনুর কোথা দেখ তো।" দাসী দেখিয়া আসিয়া বলিল, "মা, দিদিমণি ছাদের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছেন! ডাক্‌লাম, কিন্তু সাড়া দিলেন না।" "সে কি রে!" বলিয়া সরোজা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাসী তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলিয়া লইল। তাঁহার যে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, সরোজার তাহা মনেই রহিল না! ত্বরিতচরণে ভীতিপূর্ণচিত্তে কোহিনুরের কাছে আসিয়া সরোজা ডাকিলেন—"মা আমার, এমন করে পড়ে আছ কেন ?" কোনও উত্তর আসিল না। তখন সরোজা মাথার নিকট বসিয়া পড়িয়া বুঝিলেন, কোহিনুর কাঁদিতেছে। আবার নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর দিবে কে ? অনেক ডাকাডাকির পর কোহিনুরের মুখ হইতে কয়েকটীমাত্র কথা বাহির হইল—"আর কেন মা !—তোমরা আমার যা কর্‌বার তা ত খুব করেছ। বাপ্-মা হ'য়ে নিজের সন্তানের এমন কর্‌লে ? আর তোমরা কেউ আমার কাছে এস না গো ! আমি এখুনি এইখানে যেন মরি।"

সরোজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তিনি দিবারাত্র যে আশঙ্কা করিতেন, হায়, হায়, তাহাই ফলিল! তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। একেই তো তাঁর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, অল্পতেই মূর্চ্ছিত হইতেন, তাহার উপর আজ এই অসম্ভাবিত ঘটনায় আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাস-দাসীরা গোলমাল করিয়া উঠিল। একজন কর্ত্তাকে ডাকিতে ছুটিল। কিন্তু কোহিনুর উঠিল না, মুখও তুলিল না।

মণিমোহন আসিয়া স্ত্রী-কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ভীত ও বিমূঢ় হইয়া গেলেন! মুখে জল-বাতাস দিয়া সরোজা একটু সুস্থ হইলে, হঠাৎ এমন হইল কেন, কোহিনুরই বা পড়িয়া কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজা বলিলেন, "এতদিন আমরা যা ভয় ক'রে এসেছি আজ তাই ঘটেছে! কোহিনুরের সব মনে পড়েছে !" পরে স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া সরোজা বলিলেন—"আজ আমার কোহিনুরের জীবনের ভার তোমার উপর ; তুমি তা'কে বাঁচাও, সে ওইখানে পড়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বে বলেছে !" কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় মণিমোহন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হা ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল!"

তিনি নিকটে গিয়াই দেখিতে পাইলেন, কোহিনুরের হাতে তখনও সেই টেলিগ্রাম রহিয়াছে। সেখানি লইয়া পড়িয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই কোহিনুরের পূর্ব্বস্মৃতি আজ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে ; বলিলেন, "হায় মানব! তুমি নিজ-শক্তির গর্ব্বে এত অন্ধ! ঈশ্বরের বিধানের কাছে

তোমার শক্তি কতটুকু! কোন্ সাহস, কোন্ শক্তিতে তুমি পতিপ্রাণা সাধ্বীর হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য স্বামীর স্মৃতি অপসারিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলে! রমণী প্রেমের যে মিলনে একবার আবদ্ধ হয় তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার মানুষের কি সাধ্য!"

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ মণিমোহন ভূপতিতা কোহিনুরের মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, ওঠ! আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি।—তুমি মৃত হয়ে নূতন প্রাণ পেয়েছিলে, তাই আমি তোমায় নূতন করে সংসারী করেছিলাম। তোমার সে-জীবনের সঙ্গে এ-জীবনের কোনই সংস্রব নাই। সে-জীবনের এক ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া তুমি তার সঙ্গে আর কোন প্রকারে সংযুক্ত নও। মা, তুমি আমার সাধ্বী কোহিনুর, চিরদিনই তুমি সতী সাধ্বী।" কোহিনুর কোন কথার উত্তর দিল না বা মুখ তুলিয়া চাহিল না; একই ভাবে পড়িয়া রহিল। তখন রোরুদ্যমান শিশুটীকে আনিয়া সরোজা কোহিনুরের বক্ষের কাছে শুয়াইয়া দিলেন; কোহিনুর একবারমাত্র হাত উঠাইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে কাছ হইতে সরাইয়া দিয়া, তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। আজ স্নেহের সন্তানের করুণ ক্রন্দন মাতৃ-হৃদয়ে অভিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই সন্তান—এ যে আজ কোহিনুরের দারুণ লজ্জা! অনন্ত কৃতঘ্নতার ছবি!!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; ধাত্রীর ক্রোড়েই শিশু আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইল। সরোজা ও মণিমোহন কোহিনুরকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টায় শিয়রে বসিয়া রহিলেন। কোহিনুর আর মুখ তুলিল না, বা একটি প্রশ্নও করিল না বা একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। আজ তাহার অন্তরে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশের আর তাহার ভাষা নাই! তাহার এখন একমাত্র বাসনা—তাহার এই জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা এইখানেই পতিত হউক!—সে আর মানুষের সংস্রবে যাইতে চাহে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

নিবেদন

অনেক ঘুরিয়া এসেছি ছুটিয়া
বিশ্রাম লভিব বলে,
পতিত-পাবন, ওহে নারায়ণ,
স্থান দাও পদতলে!
বড়ই যাতনা—সহিতে পারি না,
হৃদয়ে ধরে না আর!

অনাথের গতি, তুমি জগপতি
করুণার পারাবার!
আঁধার হৃদয়ে তুমিই আশ্রয়
অবলার তুমি গতি,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া
ভক্তি দাও লক্ষ্মীপতি!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

হতাশে।

বীণায় বরিয়াছিনু বেহাগের সুর
　　সযতনে নিভৃতে বসিয়া,
সাধের বীণার তার ছিঁড়িল সহসা,
　　দেখিলাম বারেক চাহিয়া!

ঊষার শিশির-মাখা ফুলগুলি ল'য়ে
　　বড় সাধে গেঁথেছিনু হার,
গলায় হ'ল না পরা, রবির কিরণে
　　শুকাইল মালিকা আমার!

পূজার আরতি তরে দীপ হাতে লয়ে
　　দাঁড়াইয়া ছিলাম অঙ্গনে,
বাতাসে নিবিয়া গেল আলোক আমার,
　　অশ্রু-জল ঝরিল নয়নে!

দেখিতেছিলাম আমি নিশার স্বপনে
　　ধরা সাথে স্বরগ-মিলন,
সহসা প্রভাতরাণী আসিয়া জগতে
　　ভেঙে দিল সাধের স্বপন!

হিরণ-কিরণ-মাখা মণিময় হার
　　পরেছিনু আদরে গলায়,
বিরাক্ত সাপিনী হয়ে সেই হারগাছি
　　একদিন দংশিল আমায়!

যাহা ধরি, তাই যেন ছাই হয়ে যায়!—
　　আমি বুঝি নহি এ ধরার!
তাই যদি সত্য হয়, তবে কেন হায়,
　　প্রাণে এত জাগে হাহাকার!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

প্রলোভন।

হেরি' ঝরণার বারি যাই যদি মিটাতে পিয়াস
কে তুলিয়া দেয় মোরে হৈম পাত্রে নীর
　　　　　　　　সুবাসিত!
জুড়াতে মনের জ্বালা করি যদি মলয়ের আশ,
কে আসি' ব্যজন করে ক'রে তার কঙ্কণকণিত!
বুকের আঁধার ল'য়ে চাহি যদি হাসি জোছনায়
দেখায়ে দীপের মালা কে ধাঁধায় আমার নয়ন!
শান্ত কুটীরের কোণে নিবারিতে যাই শ্রমভার,
কে রচে সম্মুখে মম হর্ম্ম্য এক চিত্ত-সরশন!

পিকের সঙ্গীতে যাই কোলাহল থামাতে হিয়ার,
কে গাহে মধুর কণ্ঠে এস্রাজের সুর মিশাইয়া!
প্রকৃতির পূত অঙ্গ যদি যায় সাধ হেরিবার,
কারুর কৈতবলীলা কে দেখায় তখনি আসিয়া!
কেবল দুখের মূল জানি' নাথ! সবে পরিহরি'
তোমার চরণ-প্রান্ত খুঁজি যবে শান্তি-কামনায়,
ঐশ্বর্য্য-সম্ভার আনি' নয়ন-উপরি মোর ধরি'
কে আবার নিমজ্জিত করি' দেয় ভোগ-লালসায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল্।

"পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্মবিসর্জ্জন চির আত্মদান!
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা ব'য় দু'নয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান!"

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উনবিংশ-শতাব্দী দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পাদে পদার্পণ করিয়াছে; রুশিয়ার দক্ষিণে ক্রিমিয়া-প্রদেশে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এক পক্ষে রুশিয়া, অপর পক্ষে তুরস্কের সুলতান, ফরাসী ও ইংরাজ। দুর্ব্বল তুরস্ককে ক্ষমতা-লোলুপ রাজ্য-পিপাসু জারের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ আজ সুলতানের পার্শ্বে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। রুশিয়া আজ তুরস্ককে তাহার স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত করিয়া অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া, স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ ন্যায়ের ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় মস্তকে বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছে।

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। রুশিয়া-দেশে দুরন্ত শীত আরম্ভ হইয়াছে। তুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর-প্রদেশ হইতে হিমবাত প্রবাহিত হইয়া যুদ্ধক্লিষ্ট সৈনিকগণকে প্রপীড়িত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্যাপ্লাবিত শিবির-মধ্যে এক ফুট পরিমিত জল দাঁড়াইয়াছে। সৈন্যগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এমন সময়ে আবার ক্রিমিয়ার দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইল। দেখিতে না দেখিতে সাগর-বক্ষ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে ভীমবেগে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল। অর্ণবপোতসমূহ আত্মরক্ষায় বৃথা প্রয়াস পাইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইল। তীরভূমিতে সন্নিবেশিত শিবিরসমূহ প্রমত্ত প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিসাৎ হইল। ইংলণ্ড হইতে যে-সকল জাহাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিকগণের আহার-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়া আনন্দভরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আগমন করিতেছিল, দৈব-বিড়ম্বনায় তাহারা এই কালান্তক ঝড়ে বিনষ্ট হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক-পুরুষগণের অবর্ণনীয়, অনল্পমেয় ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি উপস্থিত হইল। যুদ্ধশ্রমাবসন্ন যোদ্ধৃবৃন্দ উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে অপক্ক অন্ন আহার করিয়া, কখনও বা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিল। হিমক্লিষ্ট কম্পিত কলেবর জীর্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারা অতিকষ্টে অর্দ্ধমৃতবৎ জীবন-ধারণ করিতে লাগিল; আর্দ্র ভূমিশয্যায় শ্রান্তক্লান্ত দেহ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিল; তথাপি জাতীয় গৌরব ও মার্য্যাদা-রক্ষার্থ তাহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় অম্লান-বদনে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হয়! অনশন-ক্লিষ্ট শ্রমকাতর শীতার্ত্ত সৈন্য-গণ অচিরে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শত শত রুগ্ন সৈনিক হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ, পরিমিত বস্ত্র, পথ্য

ও নিয়মিত শুশ্রূষার অভাবে বহু বীরপুরুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে যে, এই যুদ্ধে কেবলমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে হাসপাতালের ১৮০৫৮ জন লোক প্রাণত্যাগ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা নিহত হয়, তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প—মাত্র ১৫৯৮ জন। হাসপাতালের অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয় ছিল, ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অতিশয় অল্পসংখ্যক কয়েকজনমাত্র শুশ্রূষাকারিণী ছিল। পীড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন অপরের সহায়তা করিত। ঔষধ-পত্র ও অন্নাদির অভাবে চিকিৎসকগণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহেরও কোনরূপ সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। সর্ব্বত্রই একটা বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই একটা দারুণ অভাব বিরাজ করিতেছিল।

এই সকল হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া পরদুঃখকাতরা, স্নেহপ্রবণা কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-নাম্নী * এক মহাপ্রাণা মহিলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি হতভাগ্য পীড়িত সৈন্যগণের ক্লেশলাঘবে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসচিবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক্ এই সময়ে যুদ্ধসচিবও অনন্যোপায় হইয়া আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার ভার গ্রহণের জন্য কুমারী ফ্লোরেন্সের সাহায্য-প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। সুতরাং উভয়ে উভয়ের পত্র পাইয়া যার পর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দেশবাসী সকলে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মহাপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা

[* স্বদেশ-প্রেমিকা এই রমণী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডার্বিসায়ারের অন্তর্গত লিহার্ষ্ট ও হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্গত এম্‌ব্লে পার্কের ভূম্যধিকারী উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেলের সন্তানরূপে ইটালির ফ্লোরেন্স নগরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতাপিতার মধ্যমা কন্যা। ফ্লোরেন্স-নগরে ইঁহার জন্ম হওয়ায় ঐ নগরের নামানুসারে ইহারও নাম ফ্লোরেন্স রাখা হয়। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানেই ইঁহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শৈশবকাল হইতেই শান্ত স্নেহময় প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রীতির ভাব দেখা যাইত। তাঁহার ক্রীড়াকৌতুকও বৈচিত্র্যময় ছিল, এবং সেই বাল্যবয়সেই তিনি তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকাগুলির শুশ্রূষা করিতেন ও তাহাদিগের আহত স্থানে বন্ধনী বাঁধিয়া দিতে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে বিধাতার যে কার্য্যের ভার লইতে হইবে, স্বয়ং বিধাতৃ-পুরুষ যেন শৈশব হইতেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্য শিক্ষা দিতেছিলেন। কথিত আছে একটী দরিদ্র মেষপালকের একটী কুকুর সর্ব্বপ্রথম রোগিরূপে কুমারীর শুশ্রূষা লাভ করে। জীব-জন্তু হইতে ক্রমে তিনি আর্ত্ত মানবদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং যেস্থানে দুঃখ, ক্লেশ ও রোগের যাতনা, সেই স্থানেই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজ করিত। মানব-সেবায় আপনার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করাই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও পিতার অধিকারভুক্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়, রোগি-নিবাস, সংশোধনাগার ও অন্যান্য জনসেবার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকলাপ তিনি মনোনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিতেন্। কিয়ৎকাল পরে তিনি বিদেশীয় বহু রোগি-নিবাসাদিও পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ইংলণ্ডকে সেবা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনাকে এই কার্য্যের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন্। এতদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে পরে বর্ণিত হইয়াছে।]

করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত কার্য্যভার এতদিনে অর্পিত হইল। অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণের ম্লানদৃশ্য অপসারিত হইবে।" নাইটিংগেল দুর্ব্বলা নারী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে অপরিসীম সাহস ও বল ছিল। সঙ্কল্প-সাধনে তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা- ও তেজস্বিতা-সন্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইত।

হাসপাতাল-সংক্রান্ত কার্য্য-পরিচালনে নাইটিংগেলের অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা নারী ছিলেন। যৌবনের প্রথম-ভাগেই তিনি তাঁহার প্রতিবেশিনী বালিকাদিগকে বাইবেল-শিক্ষাদানের জন্য একটি 'ক্লাশ' খুলিয়াছিলেন এবং শিশুচিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহার কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের অনেক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইংলণ্ডের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী সুশিক্ষিতা নারীর যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই অভাব দূর করিয়া হাঁসপাতালের দুর্দ্দশা-মোচনের চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল।

তখন জর্ম্মণীতে শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয় ছিল। তিনি এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, শুশ্রূষা-সম্বন্ধে তিনি মনে মনে যে-সকল ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা এখানে কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুতরাং তিনিও নিজেঃ এই স্থানে রোগীর শুশ্রূষা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রীশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ছয়মাস এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই শিক্ষা তাঁহার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। এই স্থান হইতে তিনি ফ্রান্সের প্যারিস্-সহরেও সেবার বিবিধ বিধি ও রোগি নিবাস-পরিচালনা শিক্ষা করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। এক-বৎসর বিশ্রামের পর তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং স্বকীয় কার্য্যক্ষেত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি আর্ত্ত-মহিলা-সেবাসদনের (Convalescent Home for Governesses *) প্রতিষ্ঠা করিলেন ও রোগীর সেবায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দুইবৎসরের মধ্যে এই নূতন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিল। তাহার প্রথম চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি বাধ্য হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি যে দেবকার্য্য সাধন করিয়া বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২১ শে অক্টোবর ৩৪ (কাহারও মতে ৩৭, কাহারো কাহারো

* এক্ষণে ইহার নাম—"Home for Gentlewomen during temporary Illness" অর্থাৎ ভদ্রমাহলাদিগের সাময়িক রোগ-চিকিৎসা-ভবন।

বা মতে ৪২) জন শুশ্রূষানিপুণা সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে নাইটিংগেল মহান্ কঠোর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া ৫ই নবেম্বর স্কুটারিতে আসিয়া অবতরণ করিলেন। দেশ-গণের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল। এই শুভ্রবস্ত্র রমণীদিগের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাসেবিকা ; অবশিষ্ট রোগি-নিবাসের শিক্ষিতা বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। এই শুশ্রূষাকারিণীদিগের মধ্যে অনেকে সামাজিক পদমর্য্যাদায় ও সৌভাগ্য-সম্পদে গৌরবান্বিতা ছিলেন।

স্কুটারী-নগরটী তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপলের অনতিদূরে বসফোরাস্ প্রণালীর অপরতীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটি বড় হাসপাতাল ছিল। যুদ্ধকালে আহত ইংরাজ সৈনিকের আবাসরূপে তুরস্কগবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে ইহা ব্যবহৃত হইতেছিল। হাসপাতালে প্রবেশ করিয়াই নাইটিংগেল এক লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা। আহত সৈনিকপুরুষেরা রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে; সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। কেহ বা জ্বরাক্রান্ত, কেহ বা আমাশয়-রোগে শয্যাশায়ী, কেহ বা বুকে তীব্রশূলবেদনায় আক্রান্ত। রুগ্ন-ব্যক্তিগণের শয্যা ধূলায় মলিন, বহুদিন যাবৎ তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে না। গৃহের দরজা-জানালায় সুবন্দোবস্ত নাই, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের পথ রুদ্ধ। সৈন্যগণ দিন দিন ক্ষীণ ও ম্লান হইতেছে। রোগীদিগের উপ-যুক্ত পথ্যের পর্য্যাপ্ত সংস্থান নাই। মৃত্যু-বিভীষিকা সকলের ম্লান মুখচ্ছবিতে যেন প্রতিভাত হইয়াছে।

যাহারা স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, জাতীয় সম্মান ও তুরস্কের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে বিদেশে ভীষণ রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, অবশেষে তাহারাই আজ বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় মৃত্যুদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে! এই শোকাবহ-দৃশ্য-দর্শনে নাইটিংগেল একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার পাত্রী ছিলেন না ; তাই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় সঙ্গিনী-গণকে লইয়া তিনি উৎসাহভরে শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। একদল রুগ্ন-ব্যক্তিগণের গৃহ ও শয্যা পরিষ্কার করিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, অপরদল লইয়া নাইটিংগেল স্বয়ং রন্ধনশালায় গমন করিলেন। পরম যত্নে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহারা রুগ্নসৈনিকগণকে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। তাঁহারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবায় প্রাণমন সঁপিয়া দিলেন।

রোগীর সেবায় মানুষ ইহার পূর্ব্বে কখনও এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে কি-না সন্দেহ। রুগ্নব্যক্তিগণের রোগযন্ত্রণা-লাঘবের উপায়-উদ্ভাবন-চিন্তায় কুমারী ফ্লোরেন্স তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও তিনি অঙ্গব্যবচ্ছেদ-ভীত রোগীর পার্শ্বে অভয় দিতেছেন, সৈনিক-পুরুষগণের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাদের জন্য পত্র লিখিয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহাদের পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার সহানু-

ভূতিসূচক প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাহারাও সরল অন্তঃকরণে সুখদুঃখের করুণ কাহিনী তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছে। সৈনিকদের পরিবারের কোনওরূপ অর্থক্লেশ না ঘটে, এই উদ্বেগ দূরীকরণের জন্য তিনি সময় মত সৈনিকপুরুষগণের বেতন তাহাদের স্ত্রীপুত্রের নামে প্রেরণ করিতেন। রুগ্ন ব্যক্তিগণের প্রফুল্লতা-সম্পাদনের জন্য তিনি নানাপ্রকার সুপাঠ্য-পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার স্থাপিত করেন এবং তাহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার প্রীতিপ্রদ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন।

রোগীর সেবায় নাইটিংগেল অপরিসীম বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন; ইহাতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইত না। শীঘ্রই তাঁহাকে দশ সহস্র সৈনিকের সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং বস্‌ফরাসের রোগিনিবাস-সমূহের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল। এমন কি এই সময় উপর্য্যুপরি ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্তও তিনি এই কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। হাসপাতালের কর্ম্মচারিবৃন্দ সর্ব্বদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন, যখন হাসপাতাল গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, নীরব ও নিস্তব্ধ, সেই নিশীথ-সময়ে নাইটিংগেল স্নেহবৎসলা ও উদ্বিগ্না জননীর ন্যায় প্রদীপহস্তে একাকিনী কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ধীরপাদবিক্ষেপে গমন করিয়া রোগীদের অবস্থা নিজচক্ষে অবলোকন করিতেন। রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত অর্দ্ধনিদ্রামগ্ন সৈন্যগণ যেন স্বর্গরাজ্যে দেববালার হস্ত-সংস্পর্শে ক্ষণেকের তরে রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া এক অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিত। কেহ বা সেই মূর্ত্তিমতী দয়ার ছায়া-সংস্পর্শে মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গীয় বিমল সুখসাগরে নিমগ্ন হইত। তাঁহার এই সেবার সুব্যবস্থার ফলে রোগীদিগের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৪২ হইতে শতকরা মাত্র ২ জনে পরিণত হইয়াছিল। কুমারীর কি প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এই দারুণ পরিশ্রমে একবার তিনি স্বয়ং জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন্ কিন্তু তথাপি তিনি সৈন্যদিগকে তথায় ফেলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হ'ন। অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সৈনিকগণ যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তিনি সেই সময়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেলের এই অতিমানুষিক সেবাপরায়ণতা ইংলণ্ডের দরিদ্র পর্ণকুটীর-বাসী হইতে তথাকার সম্রাটের হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। ফ্লোরেন্সকে একখানি যুদ্ধের জাহাজে করিয়া স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইয়াছিল, এবং লণ্ডন-নগরী তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজনও করিতেছিল। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, এবং সেই প্রেমেরই বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন্, তাঁহারা যশ চাহেন্ না, সম্মান চাহেন্ না, নিজের কীর্ত্তি-ঢক্কা নিনাদিত করিতে চাহেন্ না;—চাহেন কর্ম্মান্তে নীরবতা। এই জন্য কুমারী নাইটিংগেল যেই তাঁহার জন্য ঐ মহৎ আয়োজনের বার্ত্তা শুনিলেন, অমনি তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, সকলে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা জানিবার অগ্রেই, নীরবে একখানি ফরাসী-পোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন

করিলেন এবং লোকচক্ষুর অগোচরে স্বীয় গ্রাম্য আবাসে প্রস্থান করিলেন। দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার পরবর্ত্তি-কালের নীরব জীবন স্বদেশের ও স্ব-জাতির অশেষ কল্যাণ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। দেশবাসী তাঁহার অক্লান্ত সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মানের জন্ত যে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলেন, তদ্দারা তিনি শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত 'নাইটিংগেল হাউস' নামে একটি শিক্ষালয় ও কয়েকটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য সংস্কার, সৈনিক-রোগিনিবাস, সৈনিক-চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়েও তিনি গভীর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেবা-সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইংলণ্ডে দলে দলে লোক সেবা-বিজ্ঞান জানিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার মতে সেবার অর্থ—রোগীর জীবনীশক্তির বিন্দুমাত্র নষ্ট না করিয়া, তাহাকে নির্ম্মল বায়ু, আলোক, উপযুক্ত উষ্ণতা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির মধ্যে রক্ষা করা এবং তাহাকে সুবিবেচিত পথ্য প্রদান করা।

কুমারী নাইটিংগেল দেশের স্বাস্থ্য-বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্ত প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তখন কি স্বদেশে কি বিদেশে, রোগিনিবাস-স্থাপনের কথা হইলেই তাহার কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মল বায়ু-চলাচল, জলনিঃসরণ, রোগবীজ-নাশের উপায়, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে কুটিরবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 'কাউন্টি কাউন্সিল টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাকশন কমিটি'-নামে এক সভার সাহায্যে তিনি চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন্। শুনা যায়, তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের অবগতির নিমিত্ত তিনি ক্রিমিয়-সমরে সৈন্তদিগের চিকিৎসার্থ প্রেরিত ব্যক্তিদিগের কার্য্য-সম্বন্ধে একটী গুপ্ত বিবরণীও প্রস্তুত করিয়া দেন। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সংগ্রাম এবং ফরাসীদিগের সহিত জর্ম্মনদিগের যুদ্ধেও তিনি প্রভূত সৎপরামর্শ দান করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড তাঁহাকে 'order of merit' উপাধি দান করেন। অবশেষে সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের অন্তে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী রমণী ইহলীলা সংবরণ করেন।

নাইটিংগেল পরার্থপরতার যে সমুজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ। তাঁহার পুণ্যপূত স্মৃতিকাহিনী চিরদিন মানব-হৃদয়ে ভক্তি, বিস্ময় ও আনন্দের উৎসস্বরূপ বিরাজিত থাকিবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তাঁহার সেবাধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্বার্থ-চিন্তারত, অনুন্নত জগৎকে যে সমুন্নত করিয়া তুলিবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

শ্রীমতী সুনীতিবালা চন্দ।

আলোর ধারা।

(ভৈরবী)

আয়! এই আলোকের ধারা নে তোর
বুক ভরে—বুক ভরে—বুক ভরে!
হৃদয়-কমল শূন্য করে, সুধা
রাখ্ ধরে—রাখ্ ধরে—রাখ্ ধরে!
আলোয় আলোয় ভরুক্ হৃদয়,
যেন কালো কোথাও একটু না রয়,
আনন্দেরি দেব্‌তা জাগুন্
রূপ ধরে—রূপ ধরে—রূপ ধরে!
কুসুম ফুটুক্ প্রাণে আমার,
তাঁর চরণে ঢালি এবার,
সকল বেসুর ডুবায়ে দি'
তাঁর সুরে—তাঁর সুরে—তাঁর সুরে!
ধন্য হউক্ সকল দিশি
সুন্দরে ঐ যাউক্ মিশি,
অরূপেরি রূপ হেরি এই
চার ধারে—চার ধারে—চার ধারে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ব্রহ্মার মূর্ত্তিপরিচয়।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি কবে গড়া আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। গান্ধার-ভাস্কর্য্যেই বোধ হয়, তাঁহার প্রথম মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া যে পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি গড়া হয় নাই, কিংবা তাঁহার ছবি আঁকা হয় নাই, এ কথা হলফ্ করিয়া বলা যায় না। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, গান্ধারের মূর্ত্তিসকল প্রায় ১০০০ বৎসরের পুরাতন।

সচরাচর যে সকল ব্রহ্মার মূর্ত্তি দেখা যায় অথবা ধ্যান হইতে যে মূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়—তিনি চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট, দ্বিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ, রক্ত অথবা রক্তগৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং তাঁহার হস্তে অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, স্রুক্ ও স্রুব-নামক দুই প্রকার যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ থাকে এবং তিনি হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ হংসই তাঁহার "বাহন"। মোটামুটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি এইরূপ। তাহা ছাড়া এই মূর্ত্তির নানাপ্রকার ভেদ আছে। এখন সে-সব লইয়া কাজ নাই। কেন যে ব্রহ্মার চারিমুখ হইল, কেন যে তাঁহার হংসবাহন হইল, কেন তাঁহার হস্তে অক্ষমালা, স্রুক্, স্রুব, ইত্যাদি দেওয়া হইল, তিনি কমলাসনাসীন কেন হইলেন তাঁহার একটা উত্তর দেওয়া চাই। উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ দেন নাই, আমিও যাহা দিব তাহাও যে অভ্রান্ত সত্য, তাহাও বলিতে পারি না; কেন না, সমস্তই প্রায় অনুমান-মূলক।

প্রথমেই তাহা হইলে ধরা যাউক্, ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল? তাহার উত্তরে পাঠকপাঠিকাবৃন্দকে আমি বিশ্বকর্ম্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিব। সেখানে দেখিবেন ঋগ্বৈদিক যুগে তিনি সর্ব্বদর্শী ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুখ, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি ছিল অথবা এইরূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক তিনি কল্পিত হইয়াছিলেন। এখনকার ছোটছেলেরা যে-ভাবে চিন্তা করে, সেইরূপেই ঋষিগণ ভাবিয়াছিলেন:—যিনি সর্ব্বদর্শী হইবেন, যিনি সৃষ্টি করিবেন, ক্ষুদ্রমানবের ন্যায় দুইচক্ষু

লইয়া তাঁহার কি হইবে॥ যতক্ষণ তিনি সম্মুখে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, পিছনে ফিরিলে সম্মুখে দেখিতে পাইবেন না। অতএব ঋষিরা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, 'অত হাঙ্গামে কাজ কি? চারিদিকেই চোখ, মুখ, হাত, পা দেওয়া যাউক্, সব গোল মিটিয়া যাইবে।' যে-সকল দেবতাকে মিলাইয়া ব্রহ্মা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা একটি। অতএব বিশ্বকর্ম্মার অবয়ব-গুলিও ব্রহ্মা পাইয়াছেন। এই ত গেল আমাদের কথা।

কিন্তু পুরাণকারেরা চারিমুখ হইবার অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহারই দুই-একটা নমুনা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কারণ, নির্ম্মল হাস্য জগতে দুর্ল্লভ। ইহা পড়িয়া যদি একটু হাসি পায় তাহা হইলেও ভাল।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায়, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তাঁহার কাজ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি (একা পারিবেন না বলিয়া) দশজন মানস ও দশজন অঙ্গজ প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। শেষ অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা। তাঁহার নানা নাম আছে, কিন্তু গায়ত্রী ও সাবিত্রী নামেই তিনি অধিক পরিচিতা। বুঝিতেই পারিতেছেন, একে ব্রহ্মার কন্যা, তাহাতে আবার প্রথম কন্যা! গায়ত্রী রূপে ভুবনমোহিনীও গুণে অসামান্যা হইলেন। ইহাই তাঁহার কাল হইল। ব্রহ্মা তাঁহার এই অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যার প্রতি প্রথমদর্শনেই প্রণয়াসক্ত হইলেন এবং "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চিৎকার করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গায়ত্রী সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া পিতাকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ব্রহ্মার তাহাকে দেখিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায় হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। সাবিত্রী একপার্শ্বে গেলেন, সেদিকেও আর একটি মুখ হইল; এইরূপ অপর পার্শ্বেও একটি ফুটিল। গায়ত্রী তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া আকাশে উড্ডীয়মানা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! উপরের দিকে মুখ করিয়া মাথার মাঝখানে আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় পাপে তাঁহার সৃষ্ট্যর্থ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া জটাদ্বারা পঞ্চমমুখটি আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। মুখ চারিটী হইয়া গেল। এই এক গল্প।

আবার বামনপুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইবামাত্রই কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টির ইহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না দেখিয়া নারায়ণ অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হওয়ায় শিব ও ব্রহ্মার তুমুল ঝগড়া হইল। ঝগড়া করিতে করিতে ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। শিব ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রভাগ দিয়া ব্রহ্মার পাঁচটি মাথার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। ব্রহ্মার চারিটি মুখ হইল।

শিবের এই ব্রহ্মহত্যা করিবার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, তাহা না

বলিলে আখ্যায়িকা শেষ হয় না; অতএব গল্পটা শেষ করাই, বোধ হয়, বাঞ্ছনীয়। শিব যেমনি ব্রহ্মার মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইলেন, অমনি ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দিলেন।—মুণ্ডটি তাঁহার হাতে আটার মত লাগিয়া গেল। এইজন্য মহাদেবের আর একটি নাম কপালী। কত তীর্থে তিনি ভ্রমণ করিলেন, নরকপাল হাত হইতে কিছুতেই খসিল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বারাণসীধামে অসী-বরুণার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। স্নান করায় ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু শাপহেতুক নরকপাল হাত হইতে খুলিয়া পড়িল না। তৎপরে তিনি ভগবান্ কেশবের পরামর্শ অনুসারে একটি হ্রদে স্নান করিতেই ব্রহ্মার মুণ্ড হাত হইতে পড়িয়া গেল। এখনও এই স্থান কপালমোচন তীর্থ বলিয়া খ্যাত।

তাঁহার হংস-বাহন কেন হইল? ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত। আমাদের যাহা উত্তর, তাহা পূর্ব্বেই দিয়াছি। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ঋগ্বৈদিকযুগে বিশ্বকর্ম্মার ডানা ছিল। এই ডানার সাহায্যে তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে, সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন। ব্রহ্মার কিন্তু ডানা নাই, বিশ্বকর্ম্মারও হাঁস নাই। বিশ্বকর্ম্মার এই ডানার বদলে ব্রহ্মাকে যে ডানাসংযুক্ত হাঁস বাহন করিয়া দেওয়া হয় নাই, ইহা ভাবিবার কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

স্রুক্ আর স্রুব যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ইহা কেন ব্রহ্মার হাতে দেওয়া হইল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ ঋত্বিক্ বা পুরোহিত। উপনিষদেও ব্রহ্মাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বলা হইয়াছে। ঋত্বিকের কাজ যজ্ঞ করা। যজ্ঞ করিতে গেলেই যজ্ঞের উপকরণ পাত্রাদির প্রয়োজন। স্রুক্ ও স্রুব যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। তাই বোধ হয় ব্রহ্মার হস্তে এই দুইটি প্রধান পাত্র দেওয়া হইয়াছে।

তিনি পদ্মযোনি কেন হইলেন এবং কেনই বা তাঁহার হাতে অক্ষমালা আসিল, তাহার একটা উত্তর দেওয়া যাউক্। পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভি হইতে একটি সনাল কমল উত্থিত হয় এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম পদ্মযোনি। উৎপত্তি হইবামাত্র ব্রহ্মা যোগ আরম্ভ করেন। অক্ষমালা সেই যোগেরই নিদর্শন।

মোটামুটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি-সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য ছিল, তাহা প্রায় সমস্ত বলা হইল। কিন্তু একই দেবতার মূর্ত্তি নানাপ্রকারের হয় কি করিয়া? আপনারা বোধ হয় জানেন, শিল্প-শাস্ত্র বলিয়া আমাদের দেশে এক প্রকার চলিত পুঁথি আছে। ইহাতে দেবতাদের মূর্ত্তি গড়িবার প্রণালী পাওয়া যায়। শিল্প-শাস্ত্র যাঁহারা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এক প্রকার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। নানাদেশের শিল্প-শাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রণালী দেওয়া আছে। শিল্পী যে প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারই বিভিন্নতায় বিভিন্ন মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের খেয়ালে মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভক্তের ইচ্ছানুসারেও মূর্ত্তির প্রকারভেদ হইয়া থাকে। ভক্ত যে মূর্ত্তিতে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপে মূর্ত্তি গঠিত হয়।

এইরূপ-ভাবে ব্রহ্মারও মূর্ত্তিভেদ সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মার যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেগুলিকে উপস্থিত নিম্নলিখিত নয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক। সাবিত্রী, সরস্বতী, হাঁস কিংবা মুনি-ঋষি বা ভক্ত কেহ উপস্থিত থাকিবেন্ না। তিনি শুধু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন কিংবা পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

(২) তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন্ হয় শুধু আসনের উপর, নয় পদ্মের উপর ; এবার একা থাকিবেন না। সাবিত্রী, সরস্বতী, হংস ও ঋষিরা সকলেই অথবা ইঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) তিনি বসিয়া থাকিবেন ; বসিবেন পদ্মের উপর। তিনি একক হইবেন। সাবিত্রী সরস্বতী ইত্যাদি পরিবারদেবতা-দিগের কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

(৪) তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবার-দেবতাগণের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৫) তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকি-বেন। সঙ্গে পরিবারদেবতাগণের সকলেই বা এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারে না।

(৬) তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস-কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবারদেবগণ উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

(৭) এই ব্রহ্মার নাম প্রজাপতি-ব্রহ্মা। মুখ একটি থাকিবে। বামে সাবিত্রী থাকিবেন। হাঁস একেবারেই থাকিবে না।

(৮) তিনি শুধুই ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং পদ্মাসনে আসীন থাকিবেন। অপর কোনও পরিবারদেবতা উপস্থিত থাকিবেন না।

(৯) ব্রহ্মার সঙ্গে হয় নন্দী (শিবের বাহন) থাকিবে, নয় গরুড় (বিষ্ণুর বাহন) থাকিবে, না হইলে ঘোড়া (সূর্য্যের বাহন) থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্য পরিবার-দেবতারা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, না থাকিতেও পারেন।

ইহা ছাড়া ব্রহ্মার কোন মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। যদি হয়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। যার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাবেই ইঁহার মূর্ত্তি গড়িতে পারে। কিন্তু মোটামুটি রূপটি তাঁহার বজায় রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে ব্রহ্মা বলিয়া চেনা যাইবে না।

মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ করা যায়। তাহার উপায়ও আছে। যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাণ। যেমন, ব্রহ্মার দুইহাত-ওয়ালা মূর্ত্তি চারিহাত-ওয়ালার চাইতে পুরাণ। যে ব্রহ্মার একমুখে দাড়ি তাহা আর একটু নূতন, যে-মূর্ত্তির চারিমুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। যে-মূর্ত্তিতে কারু-কার্য্য যত কম, সে মূর্ত্তি তত পুরাণ। খৃষ্টীয় দশম শতকের পর ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সব মুখেই দাড়ি আছে। এইরূপ অবয়ব দেখিয়াই সকল সময়ে মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ করা নিরাপদ্ নহে। যেমন, আমরা জানি গান্ধার-ভাস্কর্য্য খুব পুরাতন। ইহাতে যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই বৌদ্ধ। ইহারই মধ্যে একটিতে ব্রহ্মার

প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখে দাড়ি আছে। তাই বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ১০ম শতাব্দীতে তোলা উচিত নহে। সময়-নিরূপণ করিতে গেলেই যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া সাবধানে কাজ করিতে হয়। তাহা না হইলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মার মন্দির-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। এটা ঠিক্ যে, এককালে ব্রহ্মার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল, এককালে তাঁহার পূজা-অর্চ্চনাও হইত, এককালে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার উদ্দেশ্যে বিরাটকায় মন্দিরও তৈয়ারী করিতেন। বৌদ্ধদের উপদ্রবেই হউক্ বা শিবের অভ্যুত্থানেই হউক্, তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব সমস্তই প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের গর্ভাগারে (Sanctum Sanctorium) থাকে না; এখন তাঁহার মূর্ত্তি শোভা-বৃদ্ধির জন্য মন্দিরে স্থান পায়। কখনও দেওয়ালে, কখনও দরজার পার্শ্বে, কখনও আলিসার নীচে, চাতালে আনাচে কানাচেয় তাঁহার স্থান। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার মন্দির একেবারেই নাই? আছে। পুষ্করতীর্থে সাবিত্রী-পাহাড়ের উপর যে সাদা মন্দিরটি আছে, সেটি ব্রহ্মার। সকলেরই ধারণা,—ইহা ছাড়া ব্রহ্মার আর মন্দির ভারতবর্ষে নাই। ইহা ত ঠিক্ নহে। বুন্দেলখণ্ডের দুভাহি-নামক গ্রামে কানিংহাম একটি খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির পান। তারপর রাজপুতানায় বসন্তগড়-নামক স্থানে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। ধারওয়ার-জেলায় অন্ততঃ নয়টি ব্রহ্মার মন্দির আছে। সব চাইতে বড়, কারুকার্য্য-খচিত একটি মন্দির ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়ব্রহ্ম-নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এখানে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুধু ব্রহ্মারই পূজা করিয়া আসিতেছেন, অন্য দেবতার পূজা কখনও করেন না। শুধু তাহাই নহে, রূপমণ্ডল-নামক একখানি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিক শিল্পগ্রন্থে ব্রহ্মার মন্দির গড়িবার প্রণালী, আয়তন ইত্যাদি দেওয়া আছে। ব্রহ্মার পূর্ব্বগৌরবের এইগুলিই নিদর্শন। এই সকলই এতদিন পরেও জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হইয়া সগর্ব্বে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া তাঁহার লুপ্ত প্রভাবের কথা মানবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কে বলিতে পারে, কালের অসীম ক্ষমতাবলে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার নাম তাঁহার সৃষ্টি হইতে চির-কালের জন্য মুছিয়া যাইবে না!!

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

শারদীয়া পূজার ছুটি যখন শেষ হয়, তখন তাহা একটী স্নেহ-মধুর স্মৃতি রাখিয়া যায়। সে-স্মৃতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগ্নিপ্রদত্ত চন্দনটীকার। সে টীকা রাজার রাজটীকা অপেক্ষা অধিক আদরের, অধিক সম্মানের, অধিক ভালবাসার জিনিষ।

এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার স্মৃতি কি করিয়া যে হৃদয়ে এত গভীর রেখা-পাত করে, তাহা ভাবিবার

বিষয়। ইহাতে উপচারের আধিক্য নাই, আড়ম্বরের প্রাধান্য নাই, মন্ত্রাদির বিশিষ্টতা নাই। একটী পান, একটী সুপারি, একটী সন্দেশ, দুটী ধান-দূর্ব্বা ও একটু চন্দন,—ইহাই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মোটামুটী উপচার। তাহার পর যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্র দেন এবং পরিপাটীপূর্ব্বক আহার করান্। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে শুদ্ধ ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া, বাম হস্তে রেকাবিতে করিয়া উপচার লইয়া ভগিনী উপস্থিত হন। তাহার পর স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাহার উপর ভ্রাতাকে উপবেশন করাইয়া বাম হস্তের অনামিকা-দ্বারা চন্দন লইয়া ভ্রাতার ললাটে চন্দনের টীকা অঙ্কিত করিয়া দেন।

ইহার মন্ত্র বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল নয়, রচনা-মাহাত্ম্যে শ্রুতিমধুর নয়, গভীর দার্শনিক-তত্ত্বে পরিপুষ্ট নয়। কবি কালিদাস রায়ের ভাষায়

'শাস্ত্র আজি তা'র রুক্ষ আঁখি তুলি
শাসন করে না-ক, ধরে না দোষগুলি,
হিয়ার অন্তরে মন্ত্র জাগে যাহা
আজিকে নহে তাহা ঘৃণ্য !'

ইহার মন্ত্র সাধারণ গ্রাম্য-ভাষায় রচিত বাঙ্গালী ভগিনী-জীবনের অন্তরের কামনা। ইহাতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দেখিবার কিছুই নাই, ইহার গূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত গভীর গবেষণায় মত্ত হইবার কিছুই নাই। ইহাতে আছে বাঙ্গালী ভগ্নী-স্নেহের সহজ সরল অভিব্যক্তি, ইহাতে আছে প্রাণখোলা ভালবাসার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস। ইহার মন্ত্রটী তিনবার মাত্র আবৃত্তি করিতে হয়। ছত্র-কয়টি এই—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা
যমের দুয়ারে পড়্‌ল কাঁটা ;
যমুনা দেন যমকে ফোটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোটা ;
আমার ভাই যেন হয় সোণার ভাটা।'

এই মন্ত্রের মধ্যে হয়ত অর্থের সামঞ্জস্য নাই, রচনার পারিপাট্য নাই, ভাষার গাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু এইসকলের অভাব একমাত্র ইহার সহজ সরল ভগ্নী-হৃদয়ের ভালবাসার নিকট পরাস্ত। ইহাতে কিছুই নাই, তবুও এমন একটা জিনিষ আছে, যেটা জগতে সকলের চেয়ে দুর্লভ। ইহার মধ্য দিয়া ভগ্নী-হৃদয়ের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র সুন্দর নহে, তাহা অপেক্ষা আরও কমনীয়তর কিছু।

ভগিনী তাহার ভগিনী-জীবনের সমস্ত সাধনা ও কামনা দিয়া ভাইকে এ মর জগতে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতে চায়। যে যমুনা অনন্তকাল ধরিয়া প্রতিবর্ষে মৃত্যুরাজ যমের ললাটে চন্দন-বিন্দু দিয়া আসিতেছেন, তিনি ত' তাহারই ন্যায় ভগিনী। তাহার প্রার্থনা—ভায়ের জীবন যেন স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়, দেহ যেন জরা-রোগহীন ও সুদৃঢ় হয়। এ প্রার্থনা কত সরল, কত আন্তরিক !

'আজিকার দিনে উচ্চ-নীচ-ভেদ নাই—
ভৃত্যে বলি' দাদা আজিকে ধনী বালা
সমুখে ধরে পরমান্ন-ভরা থালা,
দাসীর কর হ'তে আশিস্ লভে আজি
প্রভুর পুত্রেরা সাদরে !'

আজিকার দিনে কেহ কখনও ভ্রাতার অথবা ভগ্নীর অভাব বোধ করে না। যাহার ভাই নাই, আজ বাঙ্গালার সমস্ত পুরুষ তাহার ভাই ; যাহার ভগিনী নাই, বাঙ্গালীর ঘরে সমুদায় নারী তাহার ভগিনী।—

'কাহার ভাই নাই, কে কাঁদে ধূলি-তলে,
মুছাও অঞ্চলে তাহার আঁখি-জলে।'

যাহার ভাই নাই সে পাড়ার ভ্রাতৃস্থানীয় সকলকে ফোটা দিয়া ভগ্নী-হৃদয়ের 'স্নেহক্ষুধা' মিটায়। যাহার বোন্ নাই সে সে-দিন স্নেহের অভাব বোধ করে না। কেহ না কেহ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ভ্রাতার আসনে বসাইয়া সানন্দে তাহার ললাটে ভ্রাতৃচিহ্ন আঁকিয়া দেয়। এ-দিন বাঙ্গালী-জীবনের শুভদিন; গুরুজনের আশীর্ব্বাদের ন্যায় শুভ, নারী-হৃদয়ের ন্যায় পবিত্র। আজ আমাদেরও প্রার্থনা কবির সঙ্গে একতানে ধ্বনিয়া উঠুক্—

'আজিকে সাত ভাই-চম্পা সম জাগি
রহ এ বঙ্গেরে উজলি!
ভ্রাতৃ-গরবিণী পারুল ভগিনীর
উঠুক হৃদি-সুধা উছলি!'

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভায়ের ভালে গন্ধঘনে
চন্দ লিখিয়া
শঙ্খ-ঘোষে জানাও যমে
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া!
অমোঘ তব মন্ত্রে অগ্নি
ভাইকে কর মৃত্যু-জয়ী!
সকল রণে অসংশয়ী
আস্‌বে জিতিয়া!

তোমার দেয়া বিজয়-ফোটা
পুণ্য প্রভাতে,—
উজ্জলিবে বিশ্বে তারে
শান্ত শোভাতে
তোমার স্বতঃ স্নেহের বাণী
শুনেন্ নিজে ত্রিশূল-পাণি,
যাঁর চরণে হে-কল্যাণি!
—শমন বিকিয়া!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গ-বধূ।

মধুর স্বপ্ন ঘোর তন্দ্রাজড়িত তরুণী-নয়নে তখনও লাগিয়া আছে; পার্শ্বে কুসুমকোরক-সম সুকুমার শিশু শায়িত। সহসা জননীর বক্ষ-আচ্ছাদন কোমল ক্ষুদ্র হস্তের তপ্তস্পর্শে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিল। সে-স্পর্শে মাতার নিদ্রা টুটিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, গবাক্ষ ভেদ করিয়া প্রত্যুষের পিঙ্গল আভা কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে; আর সেই আধ আলোক ও আধ অন্ধকারের খেলায় শিশু যোগ দিতে চাহে। তাই তাহার সেই স্নেহপিপাসু নীরব আহ্বানে তরুণী জননী শিশুর নিকট সরিয়া আসিল;— সঞ্চিত-ক্ষীরভারফুল্ল পয়োধর তনয়ের পুষ্প-পুটসম ওষ্ঠাধরের মধ্যে বিলীন হইল। তৃপ্তির মাঝে শিশুর লোচন আবার আপনা হইতেই মুদিত হইয়া গেল।

উষার আলোক-রেখা ক্রমে উজ্জল হইয়া

উঠিল। মুকুর ও চিত্রপট-শ্রেণী, গৃহকোণে বিলম্বিত রৌপ্য-মণ্ডিত যষ্টি ও জলপূর্ণ ধাতু-পাত্র হইতে আলোক প্রতিফলিত হইল। লোহিত বর্ণের সিন্দুকটি আরও লোহিত দেখাল।— প্রাঙ্গণের আম্র বৃক্ষের ঘন পল্লবে দেহ আবৃত করিয়া দোয়েল অত ডাকিতেছে কেন? হোক্ না তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বর। বনবিহঙ্গের বন্দনা-গান প্রভাতের গৌরব বটে; কিন্তু সে কাকলীতে, সে কলকোলাহলে যদি খোকা জাগিয়া উঠে! চির নব চির পুরাতন অভ্যাগতের মত যে কিরণচ্ছটা কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ত' বিধাতারই আশিস্; কিন্তু শান্ত তরঙ্গসম সুখ-শয্যায় শয়ান ঘুমন্ত তনয়ের ঘুমঘোর ঐ কিরণ-স্পর্শে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে? ভাবিতে ভাবিতে তরুণী শিশুর শিথিল ওষ্ঠপুট হইতে অতিধীরে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারপর আরও ধীরে উঠিয়া ভিত্তি-গাত্রস্থিত স্বর্গগত শ্বশুরের পটের নিম্নে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। নিঃশব্দে গবাক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, আর একবার স্নেহোৎকণ্ঠ-জড়িত সতৃষ্ণ নয়নে সুপ্ত সন্তানের বদন-পানে চাহিয়া দেখিল, আলোকহীন কক্ষে শায়িত শিশুর মুখখানি নীল সরোবরের বক্ষঃস্থিত ফুল্ল কমলের ন্যায়ই ভাসিতেছে। তাহার ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠের ক্ষীণ হাস্য-আভাটুকু সেই আঁধার কক্ষে স্তিমিত দীপালোকের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষদ্বার ও গৃহপ্রাঙ্গণে মঙ্গল-বারি সেচিত হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি গোময়-লিপ্ত হইল। পরে হস্ত ধৌত করিতে করিতে জননী আর একবার উৎকর্ণ হইয়া রহিল—সন্তানের ক্রন্দন-আহ্বান শুনিবার জন্য। না, সে ত' এখন উঠিবে না, এখনি ত' তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসা হইয়াছে। গতরাত্রের ব্যবহৃত তৈজসপত্র নিপুণ হস্তের ত্বরিত মার্জ্জনে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল; দৈনিক যজ্ঞারম্ভোপযোগী কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল, আর অমনি তনয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল। এই আহ্বানের জন্য মাতৃহৃদয় যেন এতক্ষণ ক্ষুধিত হইয়াছিল। বৈশাখের শেষে দিনের আলো যখন স্তব্ধ হইয়া থাকে, বাষ্পাকুলা ধরণীর পিপাসিত হৃদয় তখন এমনি আকুল উৎকণ্ঠার সহিত মেঘের ডাকের প্রতীক্ষা করে।

এতক্ষণে খোকার পিতামহী গঙ্গাস্নান, জপ-পূজা সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বধূর নিকট গোয়ালা দুগ্ধ দিয়া যায় নাই শুনিয়া প্রত্যহ যে সকল বিরক্তি-বাক্য উচ্চারণ করেন, সেগুলি যথারীতি উচ্চারণ করিয়া খোকাকে লইবার জন্য উপবেশন করিলেন। শিশু তখন তৃপ্ত। গিরিশিখর বহিয়া চঞ্চল জলধারা যেমন উপত্যকার উপলখণ্ডে আঘাত করে, মাতৃক্রোড় হইতে আসিবার সময় তেমনই মধুর হাসি হাসিয়া সে স্থূল হস্তদুটি প্রসারিত করিল। তখন নবীন-পুরাতনের অস্ফুট আলাপ আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যুগযুগান্তের প্রাচীন যামিনী-অঙ্ক আলোকিত করিয়া শিশু-তপন হাসিয়া উঠিয়াছিল; মহাকাশের বিশাল হৃদয় ভরিয়া হেম-বিদ্যুৎ-প্রভা এখনও হাসিয়া থাকে; প্রাচীন বৃক্ষ-কাণ্ড ঘেরিয়া প্রতিবর্ষেই নব পল্লব নৃত্য করে। নূতন-পুরাতনের এ আলাপন জগতের চিরন্তনী প্রথা। বৃদ্ধার ক্রোড়ে শিশুর শয়ন সেই প্রথারই প্রতিচ্ছায়ামাত্র।

আবার সংসারের দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হইল। স্নানের পর শুচিস্মিতা হইয়া বধূ গৃহদেবতা রাধাশ্যামের পূজার উপকরণ সজ্জিত করিয়া দিল। তাহার পর রন্ধনের পালা। দুইটি উনান জ্বালা হইল। শীঘ্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইবে। দেবর আহার করিয়া পড়িতে যাইবে। ক্ষিপ্র-হস্তের ঘন সঞ্চালনে শঙ্খ ও হেম বলয় শিঞ্জিনী-গুঞ্জন মুখর হইয়া উঠিতেছে। মর্ম্মরপ্রস্তর-সম মসৃণ ভালে চূর্ণকুন্তল স্বেদবিজড়িত;—রক্তিম গণ্ড অগ্নিতাপে আরও রক্তিম। তরুণী রমণী এখন অন্নপূর্ণা।

শ্বশ্রূ শিশুকে লইয়া নিকটস্থ বাটীতে গৃহোৎপন্ন কুষ্মাণ্ডের অংশ দিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া দেবর রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল;—তাহার হস্তে পত্র। সে পত্র খুলিয়া দেখার তখন সময় নাই। সময়াভাব না লজ্জার প্রাবল্য? অন্ন প্রস্তুত!—দেবরের সম্মুখে অন্নের পাত্র স্থাপন করা হইল। দেবরের আগ্রহ-অনুরোধ সত্ত্বেও পত্রাবরণ ছিন্ন হইল না। অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক যখন আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, তখন সে-পত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ অতিশয় দ্রুত হইলেও, বালক সন্তুষ্ট। দাদার কুশল-সংবাদ ও আগমনের দিনকাল জানিয়া লইয়া প্রফুল্লচিত্তে বালক যখন চলিয়া গেল, তখন পত্রখানির উপর আর একবার ব্যগ্র দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বধূ সেই সুদূরাগত বন্ধুকে সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিল। আজ শুভদিন, প্রভাতের বার্ত্তা বড়ই মধুর!

ক্রমে শ্বশ্রূর রন্ধনের আয়োজন, সন্তানের দুগ্ধ-জাল, বাটীর অবশিষ্ট প্রাণী কয়টির ভোজন ও আহার-পাত্র-পরিষ্কার যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর তনয়কে স্তন্যদান করিবার সময় বিশ্রাম। পাড়ার সমবয়সী সখীর দলের কেহ আসে নাই। বধূ তনয়কে আজ তাহার পিতামহীর নিকট রাখিয়া ছিন্ন-বসন-সংস্কার ও সন্তানের শয্যাবস্ত্র বা অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইল। তৎপরে শ্বশ্রূকে রামায়ণের কতক অংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়া বধূ যখন উঠিল, তখন অপরাহ্ণ।

দেবর বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছে। তাহাকে আহার্য্য দেওয়া হইল। শ্বশ্রূর আদেশে অযত্নরক্ষিত কেশের যথোচিত সংস্কার-বিন্যাস করা হইল। তাহার পর বধূ তনয়ের সিন্দুর-চর্চ্চিত অঙ্গুলী ও মুখমণ্ডল অঞ্চলদ্বারা মুছিয়া দিল। শিশুর এই নির্ব্বিকার উপদ্রব জননীর কেশ-প্রসাধনের প্রধান অন্তরায়, কিন্তু এই উপদ্রব না থাকিলে প্রসাধনের অর্দ্ধেক সুখ-অর্দ্ধেক মাধুর্য্য চলিয়া যায়।

এখন সন্ধ্যা। শঙ্খ-নিনাদে মণিকুন্তলা সন্ধ্যাকে অভিবাদন করিয়া তুলসী-বেদীর মূলের ক্ষুদ্র দীপটি প্রজ্বলিত করিয়া গৃহের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া বধূ রজনীর আহার্য্য প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করিল। সকলের আহার শেষ হইলে পর মন্থর-চরণে বধূ শয়নগৃহে গমন করিল। পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে তখনও পাঠরত দেবরের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। শ্বশ্রূ জপমালা তুলিয়া রাখিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি শয়ন করিলেন, পাদপ্রান্তে বসিয়া বধূ নিয়মিত কর্ত্তব্য পালন করিল। অবশেষে শ্বশ্রূর শয্যা হইতে নিদ্রিত সন্তানকে তুলিয়া সে শয়ন-গৃহে

আসিল। শিশু আপন শয্যায় ঘুমাইতে লাগিল। জননী গবাক্ষদ্বার-সমীপে দাঁড়াইল। তখন ক্ষীণ চন্দ্রকর গগন হইতে লুপ্ত হইয়াছে! ঊর্দ্ধ আকাশে তারার মেলা! দূরে কাননে খদ্যোতের নৃত্য। বৃক্ষমূলে একরাশ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া জোনাকি-বালা আলোক-বিন্দু পরিধান করিয়া লুব্ধ প্রণয়ীর সহিত লুকাচুরি খেলিতেছে। পার্শ্ব হইতে একটা ঝিল্লীর অশ্রান্ত ঝঙ্কার কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছে। আবার প্রদীপ-পার্শ্বে আসিয়া বধূ প্রভাতের সেই পত্র বাহির করিল। পাঠসমাপন হইলে প্রীত নেত্র সন্তানের প্রতি ধাবিত হইল। জননী দেখিল, নিদ্রিত শিশুর হস্ত আপনা হইতেই মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতেছে। সহসা তাহার পিপাসিত অধর নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শিশু জননী-অঙ্কে স্থাপিত হইল, আর জননী-বক্ষ হইতে স্নেহ-ধারা কোমল টানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সারা বঙ্গের হৃদয় এখন নিদ্রিত। বঙ্গের জননী ও বঙ্গের আশা মুদিত পদ্মের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের ঘন কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল হইতে নিদ্রা আসিয়াছে! স্পর্শ-কোমল মায়াময় অঙ্গুলি বুলাইয়া তাহাদের চক্ষের চেতনা অপহরণ করিয়াছে। নীলাম্বর লক্ষ নেত্র মেলিয়া অপলক-ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। জগৎ স্তব্ধ! তাহার বিরাট হৃদয় স্পন্দনহীন। চতুর্দ্দিকে অসীম শান্তি বিরাজমান। তাহারি মাঝে পৃথিবীর সুপ্ত জীব তৃপ্তির সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। সে সন্ধান সার্থক হউক। তাহাদের নিদ্রা রজনীর নীরবতার ন্যায় গাঢ় হউক্। অগণিত তারার উৎফুল্ল হাস্যের ন্যায় তাহাদের অন্তর পবিত্র হউক্। আর যে বসন্ত-নিঃশ্বাস-সুরভিত নৈশ সমীরণের মৃদু-চঞ্চলগতি-বেগে ক্লান্ত জননীর বস্ত্রাঞ্চল কম্পিত হইতেছে, শিশুর অনিবিড় লঘু কেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই স্নিগ্ধ প্রফুল্ল সমীরণের মতই মাতাপুত্রের জীবন স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হউক্! ঐ কক্ষ বঙ্গের হৃদয়, ঐ তরুণী বঙ্গের জননী, আর ঐ শিশু বঙ্গের ভরসা।

নানা কথা।

১। চীন-দেশের কোন কোন স্থানে বিবাহের জন্য একরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাটীর বাহিরে কলসী বা ভাণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সেইগুলি বিবাহের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। কলসীর মুখ নীচের দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, বাটীর কন্যার বিবাহের বয়স হয় নাই। কলসীর মুখটী রাস্তার দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছে। কন্যার বিবাহ হইয়া গেলে কলসী তথায় আর রাখা হয় না

২। গতবর্ষের বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ, শুশ্রূষাকারিণী ও ঔষধ প্রস্তুতকারিণী মহিলা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাখা-সমূহের পক্ষে এইসকল বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছাত্রী-লাভও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কন্যাদিগের মাতা-পিতা, অভিবাবক-অভিবাবিকা অথবা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি সদ্‌বংশজাত কন্যাদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত করেন, তাহা

হইলে তাঁহাদের প্রভূত সাহায্য হয়। শিক্ষাবস্থায় এবং পরবর্ত্তি-কালেও ঐ সকল কন্যাদিগের মঙ্গলবিধানের জন্য কোনওরূপ ত্রুটী হইবে না।

৩। মহামারীর কবল হইতে দেশবাসী কিরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহার বিষয় তাহাদিগকে জানাইবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই নবেম্বর মাস হইতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবেন্ স্থির করিয়াছেন্। তথাকার সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টারের উপর এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত কতিপয় সাব-এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষালাভের পর, ভ্রমণশীল ঔষধাগার লইয়া জনসাধারণের নিকট ম্যাজিকলণ্ঠন দেখাইয়া উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন্ এবং মহামারী সম্বন্ধে পুস্তিকা-বিতরণ করিবেন্। ইহার জন্য আবশ্যক টাকাও গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন্।

৪। ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসিতেছেন, এজন্য এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রভূত আয়োজন হইতেছে। যুবরাজ জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দনাদি প্রদানের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন্, তাঁহারা যদি সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের হিতকল্পে সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র মোচনের অথবা তাদৃশ প্রশংসার্হ কার্য্যের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর প্রীতিলাভ করিবেন্।

৫। বায়োস্কোপে যে-সমস্ত চিত্র দেখান হয়, তাহা প্রায়ই বাস্তব ঘটনার অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতির দ্বারা অভিনীত বাস্তব ঘটনার অনুরূপ ব্যাপারের। এই অভিনেতারা অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়া থাকে। মিস্ মড্লিন্ ডেভিস্ নাম্নী এক মহিলা এইরূপ একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। সম্প্রতি ইনি পূর্ণবেগে চলনশীল একখানি মোটরগাড়ী হইতে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে আরোহণ করিতেছিলেন্। এরোপ্লেন হইতে একটী দড়ির সিঁড়ি ঝুলিতেছিল; তাহা হইতে আবার একটী শুধু দড়ি ঝোলান ছিল। মহিলাটী যথাসময়ে দড়ি ধরেন্। কিন্তু এরোপ্লেনটী যেই উপরে উঠিতে থাকে, তখন হঠাৎ তাঁহার হাত ছাড়িয়া যায় এবং প্রায় ১৫ ফিট উচ্চ হইতে তিনি ভূমিতে পতিত হন্। বহু দর্শক তাঁহার এই আরোহণ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন্। কিন্তু উক্ত আঘাতেই ঐ অসমসাহসিকা রমণী যমসদনের অতিথি হইয়াছেন্।

৬। লণ্ডন-সহরের কতিপয় বস্ত্রবিপণিতে একটী নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। কেহ বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিলে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া সেই বস্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয়। কত গজ বস্ত্র ইহার মধ্য দিয়া যাইতেছে, তাহা ইহা দ্বারা আপনা আপনি সূচিত হইতে থাকে এবং যথাস্থানে কাটিয়া দিয়া ইহা ক্রেতাকে কত মূল্য দিতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দেয়।

৭। ব্রহ্মদেশ এতদিন ছোটলাট-বাহাদুরের শাসনাধীন ছিল। এইবার উহাকে প্রদেশে বা "প্রভিন্সে" পরিণত করিয়া উহার জন্য গবর্ণর বা লাট-বাহাদুর নিযুক্ত হইতে চলিলেন। ব্রহ্মদেশের লাটের বার্ষিক বেতন ১,০০,০০০৲ টাকা এবং তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্যদিগের বেতন ৬০,০০০৲ ষাট্ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 700. December, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০০ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। ডিসেম্বর, ১৯২১। ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

তুমি।

আনন্দ-দোল লেগেছে,
অঙ্গে অঙ্গে তোমার চুমা
কুসুম হ'য়ে জেগেছে!
গন্ধে নিজ হৃদয় দিয়া
আলিঙ্গিলে এ মোর হিয়া!—
মনের ভুলে উঠ্‌নু দুলে'
শিহরি'!—
এমনি তুমি বেড়াও চুমি'
বিহরি'!

কি সুর সখা, বাজা'লে!
ক্ষেপিয়ে দিলে বনের বায়ু
কানন-ভূমি সাজা'লে!
পীযুষভ্রব আলোক হ'য়ে
ডুবায় বুকে নিখিল ল'য়ে!
আকাশ ধরা মিলন করা
বাহিনী—
হে মোর গুণী, বাজাও শুনি
কাহিনী!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমাদের দেশে লোকে সাধারণতঃ কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন; খুব কম লোকেই চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেন বা সে-সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে এই বিদ্যাটীর যেন কোনই মূল্য নাই, যেন ইহা সুকুমার কলার একটী অঙ্গই নহে। একখানি চিত্রের ভাল-মন্দ অবধারণ করিতে আমাদের কয়েক

হইলে তাঁহাদের প্রভূত সাহায্য হয়। শিক্ষাবস্থায় এবং পরবর্ত্তি-কালেও ঐ সকল কন্যাদিগের মঙ্গলবিধানের জন্য কোনওরূপ ত্রুটী হইবে না।

৩। মহামারীর কবল হইতে দেশবাসী কিরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহার বিষয় তাহাদিগকে জানাইবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই নবেম্বর মাস হইতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তথাকার সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টারের উপর এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত কতিপয় সাব-এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষালাভের পর, ভ্রমণশীল ঔষধাগার লইয়া জনসাধারণের নিকট ম্যাজিকলণ্ঠন দেখাইয়া উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন এবং মহামারী সম্বন্ধে পুস্তিকা-বিতরণ করিবেন। ইহার জন্য আবশ্যক টাকাও গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসিতেছেন, এজন্য এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রভূত আয়োজন হইতেছে। যুবরাজ জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দনাদি প্রদানের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের হিতকল্পে সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র মোচনের অথবা তাদৃশ প্রশংসার্হ কার্য্যের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর প্রীতিলাভ করিবেন।

৫। বায়োস্কোপে যে-সমস্ত চিত্র দেখান হয়, তাহা প্রায়ই বাস্তব ঘটনার অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতির দ্বারা অভিনীত বাস্তব ঘটনার অনুরূপ ব্যাপারের। এই অভিনেতারা অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়া থাকে। মিস্ মড্লিন্ ডেভিস্ নাম্নী এক মহিলা এইরূপ একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। সম্প্রতি ইনি পূর্ণবেগে চলনশীল একখানি মোটরগাড়ী হইতে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে আরোহণ করিতেছিলেন। এরোপ্লেন হইতে একটী দড়ির সিঁড়ি ঝুলিতেছিল; তাহা হইতে আবার একটী শুধু দড়ি ঝোলান ছিল। মহিলাটী যথাসময়ে দড়ি ধরেন। কিন্তু এরোপ্লেনটী যেই উপরে উঠিতে থাকে, তখন হঠাৎ তাঁহার হাত ছাড়িয়া যায় এবং প্রায় ১৫ ফিট উচ্চ হইতে তিনি ভূমিতে পতিত হন্। বহু দর্শক তাঁহার এই আরোহণ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত আঘাতেই ঐ অসমসাহসিকা রমণী যমসদনের অতিথি হইয়াছেন।

৬। লণ্ডন-সহরের কতিপয় বস্ত্রবিপণিতে একটী নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। কেহ বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিলে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া সেই বস্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয়। কত গজ বস্ত্র ইহার মধ্য দিয়া যাইতেছে, তাহা ইহা দ্বারা আপনা আপনি সূচিত হইতে থাকে এবং যথাস্থানে কাটিয়া দিয়া ইহা ক্রেতাকে কত মূল্য দিতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দেয়।

৭। ব্রহ্মদেশ এতদিন ছোটলাট-বাহাদুরের শাসনাধীনে ছিল। এইবার উহাকে প্রদেশে বা "প্রভিন্সে" পরিণত করিয়া উহার জন্য গবর্ণর বা লাট-বাহাদুর নিযুক্ত হইতে চলিলেন। ব্রহ্মদেশের লাটের বার্ষিক বেতন ১,০০,০০০৲ টাকা এবং তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্যদিগের বেতন ৬০,০০০৲ ষাট্ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 700. December, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০০ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। ডিসেম্বর, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

তুমি।

আনন্দ-দোল লেগেছে,
অঙ্গে অঙ্গে তোমার চুমা
কুসুম হ'য়ে জেগেছে!
গন্ধে নিজ হৃদয় দিয়া
আলিঙ্গিলে এ মোর হিয়া!—
মনের ভুলে উঠ্‌নু দুলে'
শিহরি'!—
এম্‌নি তুমি বেড়াও চুমি'
বিহরি'!

কি সুর সখা, বাজা'লে!
ক্ষেপিয়ে দিলে বনের বায়ু
কানন-ভূমি লাজা'লে!
পীযুষদ্রব আলোক হ'য়ে
ডুবায় বুকে নিখিল ল'য়ে!
আকাশ ধরা মিলন করা
বাহিনী—
হে মোর গুণী, বাজাও শুনি
কাহিনী!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমাদের দেশে লোকে সাধারণতঃ কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন; খুব কম লোকেই চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেন বা সে-সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে এই বিদ্যাটীর যেন কোনই মূল্য নাই, যেন ইহা সুকুমার কলার একটী অঙ্গই নহে। একখানি চিত্রের ভাল-মন্দ অবধারণ করিতে আমাদের কয়েক

মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগে না; তবে চিত্রের বহিরবয়বটী যদি মনোজ্ঞ হয়, দুইদণ্ড তাকাইয়া দেখি, এই পর্য্যন্ত। অতীতের দোহাই দিয়া অনবরত আমরা বর্ত্তমানের সমস্ত দীনতা ঢাকিতে চেষ্টা করি। অথচ আমাদের কৃতিবিদ্য সুধীগণও ভারতের প্রাচীন চিত্র-কলার কোন সন্ধান রাখেন না। গ্রিফিথ্ হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিগণ বিশেষ যত্ন এবং আগ্রহের সহিত ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনা করেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা-গান করিয়াছেন। দেশের বিদ্যাসম্বন্ধে আজও অধিকাংশ লোকই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—বড় জোর কেহ কেহ বিদেশীয় মতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, তাঁহারা চিত্রবিদ্যাকে নিতান্ত লঘু ও শূন্যগর্ভ বিবেচনা করেন।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও একটী বঙ্গীয় চিত্রকর-সম্প্রদায় চিত্রবিদ্যার প্রতি দেশের এই নিদারুণ প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন এবং সহস্র নাসিকা-কুঞ্চন ও তাচ্ছীল্যকে তুচ্ছ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির পথে বীরের ন্যায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই এই চিত্রসেনানীদলের নেতা। কয়েক মাস হইল, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সাধু প্রচেষ্টায় যোগদান করিয়াছেন এবং ঠাকুর-মহাশয়কেই আচার্য্যের পদে বরণ করিয়া-ছেন্। এই চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা আশার অমৃতবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। প্রত্যেক চিত্রা-নুরাগী ব্যক্তির এই স্থায় সঙ্কল্পে যথাশক্তি সহায়তা করা উচিত। সেতু-বন্ধনে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিড়ালীর সাহায্যও অগ্রাহ্য হয় নাই। বর্ত্তমান সন্দর্ভ-রচনায় পাঠকবর্গের নিকট এই আমার বিনীত কৈফিয়ৎ।

চিত্রকলা কেবল অবসর-সময়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করিবার নিমিত্ত নহে,—চিত্রাঙ্কণ-শিল্পও অবসর-কালের অধ্যয়ন-সাধ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহা 'বেগার ঠেলার' জিনিষ নহে। যখন কোন কাজ নাই, এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া বসিয়া গেলাম ও চিত্র আঁকিয়া উঠিলাম, ব্যাপারটা কি এতই সহজ? ইহা বিলাসিনীর অবসাদ-ক্লান্তির উপশম অথবা ধনি-জনের গৃহসজ্জার উপকরণমাত্র নহে। যিনি এই বিদ্যা লাভ করিতে উৎসুক শুদ্ধ-সত্বচিত্তে তাঁহাকে কলাদেবীর আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে—সমাহিত হইয়া অনুদিন একমাত্র দেবতার অনুধ্যান করিতে হইবে। অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যেন কেহ এই চারুকলার সাধনায় অগ্রসর না হন। বাল্যাবধি যাঁহাদের চিত্ত সৌন্দর্য্যের উপাসক—অধ্যবসায় যাঁহাদের অনন্যসাধারণ, কলাশিল্পের আলো-চনার অধিকারী তাঁহারাই;—তাঁহারাই মানব-চিত্তে চিরস্থায়ী আসনলাভে সমর্থ। লিওনার্ডো-ডা-ভিঞ্চি তাঁহার জগৎপ্রথিত চিত্র "মোনা লিসা"-অঙ্কনে যে প্রগাঢ় সৌন্দর্য্যানুভূতি ও অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে তাহা বাস্তবিকই তুলনা-রহিত। কথিত আছে, একবার প্রণয়িনী লিসার অধরপুটে অর্দ্ধেন্দু-উজ্জ্বল হাস্যভঙ্গী দেখিয়া ডাভিঞ্চি এতদূর মুগ্ধ হন যে, চিত্রে তাহাকে চিরন্তন রূপ দান করিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রিয়ার মোহন আস্যে বিনোদ-হাস্যের কৌমুদীরেখা আর ফুটিল না! ব্যর্থকাম শিল্পী মুগ্ধহৃদয়ের হারাণ ভাবটীকে রূপের নিগড়ে বাঁধিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইল; লিসা আর একবার সেই হাসি হাসিলেন। গুণী তাহাকে মূর্ত্তিদান করিয়া ধন্য ও অমর হইলেন। সাধনার এইরূপ একাগ্রতা না থাকিলে কি শিল্পী হওয়া যায়?

চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়া মানব-মনের ক্রম-বিবর্ত্তনের সূক্ষ্মধারাটীর সন্ধান পাওয়া যায়। সভ্যতার প্রথম মানদণ্ড সৌন্দর্য্যানুভূতি। বৈদিকযুগের আর্য্যগণ প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর হইতে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের এই সৌন্দর্য্যবোধ ক্রমশঃ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিত্রের মধ্যে মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, তথা সভ্যতার ইতিহাসই উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত আছে। সুতরাং, এই বহুপ্রাচীন কলাশিল্প যে বিশেষভাবে আমাদের অনুশীলনের যোগ্য, সে বিষয়ে দুইমত হইতে পারে না। ইহা একদিকে সুকুমার কলা ও অপরদিকে মানবচিত্তের ক্রমবিকাশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

চিত্রশিল্প বহু প্রাচীন;—কত প্রাচীন তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। চিত্রকলার আদিম অবস্থায় নানাবিধ জীবজন্তুর প্রতিকৃতির চিত্রই পাওয়া যায়। সে-সকলও আবার হরিণের শিং অথবা হাড়ের উপর ক্ষোদিত। ইহার অব্যবহিত পরের অবস্থায় আমরা নানাবিধ ভাস্কর্য্য-শিল্প ও মন্দির- অথবা সমাধি-গাত্রে অঙ্কিত বহুপ্রকারের চিত্রাবলির সন্ধান পাই। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ইজিপ্ট ও অ্যাসিরিয়া দেশে এইপ্রকারের শিল্পের নিদর্শন অদ্যাপি বহুস্থানে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় বিবুধগণ প্রমাণ করিয়াছেন, খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে এই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। তথায় চিত্রদ্বারাই * লিপিকার্য্য সম্পন্ন হইত; ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রকাশ করিতে তথায় ভিন্ন ভিন্নরূপ চিত্র অঙ্কিত হইত। বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রায় ৩০০০ বৎসরের পুরাতন একখানি মিশরীয় (Egyptian) চিত্র আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, উহাতে খৃঃ পূঃ ১৯০০ সালে থিব-নগরের প্রাচীর চিত্রিত ছিল। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাচীন-যুগে চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইলোরা- এবং অজন্তা-গুহামন্দিরের গাত্র-শোভিত সহস্র চিত্র এই সুদূর যুগেও অতীত-ভারতের অননুকরণীয় কলাকৌশলের অনবদ্য মহিমা গম্ভীর-রবে ঘোষণা করিতেছে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, হয় ত, এই সকল পুরাতন চিত্র হইতে দুই একটা দোষ আবিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এবং নিজস্ব গৌরবের কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

খৃষ্টের চারি শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীসদেশে চিত্রশিল্পের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অপরাপর গ্রীকচিত্রকরগণের মধ্যে এ্যারিষ্টটল্-প্রশংসিত পলিগনোটাস্, এপিনিক্ ও রোড্‌স্-নিবাসী প্রোটোজিনিস্ সবিশেষ পরিচিত। কথিত

* Hieroglyphic.

আছে, ডিমিট্রিয়স্ যখন রোড্স্-নগর আক্রমণ করেন্, তখন প্রোটোজিনিস্ চিত্রাগারে বসিয়া একখানি চিত্র আঁকিতেছিলেন। পাছে নগর-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই অপূর্ব্ব সুন্দর আলেখ্য-খানি অগ্নিগর্ভে সমাধিলাভ করে, এই আশঙ্কায় বিজয়ী বীর ডিমিট্রিয়স্ বিচলিত হইয়া পড়েন। উল্লিখিত আখ্যান হইতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশ হয় যে, সেই কালে গ্রীক্ শিল্প মহিমার গৌরীশৃঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশেও মূর্ত্তিপূজার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে।

"কান্তিভূষণ-ভাবাঢ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।
অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজায় জনার্দ্দনঃ॥"

'যেহেতু চিত্রে কান্তি ভূষণ ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেইজন্য চিত্রজ প্রতিমা-নিচয়ে জনার্দ্দন সাধকের নিকট আগমন করেন।' এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতবাসী চিত্রকলার সমুন্নয়নকল্পে তাহাদের সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল এবং বহুল পরিমাণে যে সফলকামও হইয়াছিল সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

ভারতীয় চিত্রশিল্প যে আমাদের বহুকালের সম্পত্তি, তাহা মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক শকুন্তলা-পাঠেই জানা যায়। উক্ত নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে ভারতীয় লৌকিক কলারীতির যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ধীবরের নিকট প্রাপ্ত অঙ্গুরীয়ের দর্শনে দুষ্মন্তের শকুন্তলা-সম্বন্ধে সমস্ত স্মৃতির অভ্যুদয় এবং সেই সঙ্গে নিরপরাধাকে প্রত্যাখ্যান-হেতু দারুণ অনুশোচনার আবির্ভাব হইয়াছে। তাই দুষ্মন্ত স্বহস্তে প্রত্যাখ্যাতা প্রেমময়ী পত্নীর একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রদর্শনে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—

"সাহু বঅস্স। মহুরাবত্থাণদংসনিজ্জো ভাবাণুপ্পবেসো।
খলদি বিঅ মে দিট্ঠী ণিম্নুণ্ণদপ্পদেসেহু।"

"সাধু বয়স্য, বিন্যাসমাধুর্য্যে ভাবের অভি-ব্যক্তি সুন্দর হইয়াছে। উচ্চ নীচ অংশগুলিতে যেন দৃষ্টিস্খলন হইতেছে।"

আলো ও ছায়ার পরিস্ফুট জ্ঞান ব্যতীত নিম্নোন্নত প্রদেশ দেখান কখনই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথবা ইহাকে নিছক কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। বিষমপশ্চাত্তাপক্লিষ্ট, অপগতাভিশাপ প্রেমিক দুষ্মন্ত কিরূপ ভাবের সহিত প্রিয়তমার প্রতি-কৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ে প্রকাশ পায়।—

'অস্ত্যত্র মে ভাবচিহ্নম্।
স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।
অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্ণিকোচ্ছ্বাসাৎ॥

[অর্থাৎ 'এই চিত্রে আমার অনুরাগচিহ্ন আছে। চিত্রের প্রান্তভাগে স্বেদসিক্ত অঙ্গুলির সংস্থাপন জন্য ইহা মলিন দেখাইতেছে; এবং আমার নেত্র হইতে যে অশ্রু ঐ চিত্রিত আকৃতির গণ্ডস্থলে পতিত হইয়াছিল, চিত্রপটটী ফুলিয়া উঠায় তাহাও দেখা যাইতেছে।'] এই অসমাপ্ত চিত্রের পশ্চাদ্ভূমি (Back ground) কি হইবে, তদ্বিষয়ে মহারাজ দুষ্মন্ত স্বয়ং বলিয়াছেন্—

কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

[অর্থাৎ স্রোতস্বিনী মালিনী আঁকিতে হইবে; তাহার তটদেশে হংসমিথুন নিভৃতে শয়িত

থাকিবে ; আর তাহার উভয় পার্শ্বে পার্ব্বতীর পিতৃদেব হিমাচলের পবিত্র পাদদেশস্থিত কয়েকটী পর্ব্বতও অঙ্কিত করিতে হইবে। সেই পর্ব্বতে হরিণগণ সুখে উপবিষ্ট থাকিবে। (তাহার পর) শাখা হইতে বল্কল ঝুলিতেছে এইরূপ তরুর নিম্নে মৃগী কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গে আপনার বাম নয়ন ঘর্ষণ করিতেছে, আঁকিতে ইচ্ছা করি।]

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কালিদাসের সময়ে এবং পূর্ব্বে চিত্রশিল্পের অভ্যুত্থান ত হইয়াছিল বটেই, পরন্ত ইহা সবিশেষ উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল। মহারাজচক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ত চিত্রবিদ্যায় স্বীয় জ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ যে নৈসর্গিকদৃশ্য অঙ্কনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কখনই কলাশিল্পের কৈশোরাবস্থার সম্পত্তি হইতে পারে না। ঐ সমস্ত যথাযথভাবে চিত্রে পরিস্ফুট করিতে হইলে আলো ও ছায়া এবং দূরত্বানুসারে আকারের হ্রাসবৃদ্ধির (perspective) সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনেও যে আর্য্যগণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা "উত্তররামচরিতের" প্রথমাঙ্কের বর্ণনা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। বনবাসকালের চিত্র দেখিয়া আত্মবিস্মৃতা জানকী বলিয়াছিলেন—

"অজ্জ উত্ত ! এদিণা চিত্তদংসণেণ পচ্চুপ্পণ্ণদোহলাএ অথি মে বিণ্ণপ্পো।" "আর্য্যপুত্র, এই ছবি দেখিয়া আমার মনে অভিলাষ জাগিতেছে, তাহা বলিব।"

বৌদ্ধযুগে যে এই সুকুমার শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অজন্তাগুহার গাত্রে অঙ্কিত চিত্রনিচয় দেখিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রবিদ্ গ্রিফিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন— "এই সকল চিত্র অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ ভারতীয় শিক্ষার্থীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা অসম্ভব। ইহারা বাস্তবিকই অদ্ভুত।"

মধ্যযুগে কোন চিত্রকরের বিশেষ শিক্ষানুসারে বলা হইত—'ইনি অমুক-সম্প্রদায়ভুক্ত'। সম্প্রদায় কথাটী কিন্তু ঠিক্ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ কোন বিশেষ দেশের চিত্রকরগণকে অন্যদেশস্থ চিত্রকরসমূহ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য এই শব্দটীর ব্যবহার হয় ;—যেমন ডাচ্-সম্প্রদায়। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে, কোন বিশেষ চিত্রকরের অনুসরণকারী শিল্পিসমূহকে বুঝাইবার নিমিত্তও শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে ;—যেমন পেরুগিনোর সম্প্রদায়। তৃতীয়তঃ, সম্প্রদায় কথাটী কোন বিশেষ দেশে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় বর্ণ- ও অবয়ব-বিশিষ্ট এবং এক সাধারণ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত অপর চিত্রচয়কে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় ;—যেমন, ফ্লোরেন্টাইন্ সম্প্রদায়, রাজপূতচিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি।

এইরূপ বিভাগ কিন্তু অনেকদিন যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। "চিত্রকলার আদর্শটী পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবধারার মধ্যে বিদ্যমান। ইহা কলাবিদের উপর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনও প্রভাব বিস্তার করে না, বিগত যুগের চিত্রসমূহ তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধকে একটী বিশেষ রূপ দান করে মাত্র।"* এখন এই শিল্পশিক্ষার্থীকে পূর্ব্বের মত কোন একটী ক্ষুদ্রগণ্ডীর ভিতর একান্তভাবে আবদ্ধ থাকিতে হয় না ; বন্ধনবিমুক্ত ছাত্র এখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতই অসীম নীলিমার মধ্যে যেথানে খুসী উড়িয়া বেড়াইতে পারে। শৈশবে কোনও শিক্ষকের নিকট বিদ্যালাভ করিয়া সে নিজের ভবিষ্যৎ

* Walter Pater.

জীবন নিজেই গড়িয়া তুলে। এক স্থান হইতে হয় ত সে শিল্পসম্পর্কীয় কোন একটী অসংলগ্ন ধারণা সংগ্রহ করিল, কোথাও হইতে বা অপর একটী নূতন তত্ব লাভ করিয়া স্বকীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিল। আবেষ্টন ও সময়ের প্রভাব ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রভাবই তাহার নিকট ব্যর্থ। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"চিত্রকর তাহার সময়ের সন্তান।" চিত্রপটে তাহার জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্রই কল্পনার মহনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দিব্য-বিভায় দেদীপ্যমান থাকে। দয়া, ভক্তি, প্রেম, শৌর্য্য প্রভৃতি মানবহৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তি-নিচয় চিত্রকরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যানুভূতির অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া মানব-সাধারণের সুপ্ত চেতনাকে মুহূর্ত্তেই যেন সজাগ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে।

শিল্পের উদ্দেশ্য মুখ্যভাবে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সেই নিমিত্ত আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ভিতর সৌন্দর্য্য-কথাটির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হইতেছে; সুতরাং, সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে দুই একটি কথা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সৌন্দর্য্যকে সাধারণভাবে দুই প্রধান বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—আবয়বিক ও আন্তর। যে কোন সৌষ্ঠব-সমন্বিত বস্তু তাহার বাহ্য চাকচিক্যের দ্বারা আমাদের চর্ম্মচক্ষুকে মোহিত করিতে পারে। এখানে দ্রষ্টা মানুষের একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ এবং দৃষ্ট একটি স্থূলবস্তু। ইহার সহিত মনের সম্পর্ক সামান্য (?)। "তবে কেন যে আমরা একটি জিনিষ দেখিয়া আনন্দিত এবং অন্য একটি দেখিয়া বিরক্ত হই, ইহার উত্তর দেওয়া চিনির মিষ্টতা ও নিমের তিক্ততার কারণ-নির্দ্দেশ করার মতই অসম্ভব। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ইহা আমাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস।" * মানবের এই জন্মগত সাধারণ গুণ শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব-হেতু বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষাগুণে আমরা সেই সকল বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট হই, যাহা আমাদের নীতি-বৃত্তির সহিত সুসমঞ্জস হয়; এবং কুরুচিপূর্ণ দ্রব্য সুন্দর হইলেও পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হই। ইহাকে আমরা রুচি বা 'টেষ্ট' নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অবশ্য স্বাভাবিকী বৃত্তির সহিত যখন শিক্ষা বা নীতির কথা আসিয়া পড়ে, তখন সৌন্দর্য্যাবধারণে বুদ্ধির সহায়তাকে একেবারে পরিহার করা অসম্ভব। মানুষের নীতিবোধের মূলে বুদ্ধি; সুতরাং, যখন নীতির কথা উত্থাপন করি, তখন এই সৌন্দর্য্যবোধকে রুচি না বলিয়া বিচার বলাই যুক্তিযুক্ত। রুচির এই অবস্থাটি, আমার বিবেচনায়, আন্তর সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে কতক পরিমাণে আসিয়া পড়ে।

আন্তরসৌন্দর্য্য যাহাকে বলে, সে জিনিষটা তাহার বাহ্য অবয়বের চেয়ে অনেকখানি বেশী —যেমন উচ্চাঙ্গের কবিতায় যাহা বলে, তাহা ছাড়াও অনেকখানি অর্থ গোপন করিয়া রাখে;—যাহাকে মিল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"where more is meant than meets ear." আমরা ইহাকে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য-নামে অভিহিত করিতে পারি। এখানে দ্রষ্টা ইন্দ্রিয় নহে এবং দৃষ্ট বস্তুও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। এই সৌন্দর্য্যের উপাসক ও দ্রষ্টা ঋষি, কবি, শিল্পী। ঐ যে ঐখানে বিরহিণী পতিবিয়োগদুঃখে

* Ruskin.

মলিনা, শীকর-সম্পৃক্ত ইন্দীবরের ন্যায় অশ্রুভারনমিতলোচনা, অঙ্গের বসন বিস্রস্ত, কেশপাশ বিপর্য্যস্ত, দেখিবার মত উহাতে কিছুই নাই! উহার সৌন্দর্য্য, সৌঠবের একান্ত অভাবে—মলিনতাই উহার সৌন্দর্য্য! ঐ নয়নযুগলে উহার হৃদয় প্রতিফলিত,—দয়িতের উদ্দেশে উহার আঁখিপাখী উধাও ছুটিয়াছে বেদনার বর্ষণের মধ্য দিয়া!—মুখের প্রত্যেক রেখাটী তাহার প্রাণের গুপ্ততম সংবাদ যেন ডাকিয়া বলিয়া দিতেছে। কেবল চোখে দেখিলেই উহার মাধুর্য্য উপলব্ধ হইবে না। সম্ভ্রমের সহিত হৃদয়মধ্যে প্রিয়তমের অভাবে নিজের মানসিক অবস্থার সহিত এই বিরহিতার অবস্থার সামঞ্জস্য অনুভব করিতে হইবে, নচেৎ আমরা ঐ রমণীর সৌন্দর্য্যের অতীন্দ্রিয়তার সন্ধান পাইব না।—বিরহী ব্যতীত বিরহের মর্ম্ম কে বুঝিবে? অতএব দেখিতে পাইতেছি, এই সৌন্দর্য্য-প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে একটী জটিল মানসিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

প্রথমে চিত্রপর্য্যবেক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ চিত্রের বাহ্য অবয়ব হইতে বুদ্ধির সাহায্যে উহার মানসিক অবস্থার পরিচয় গ্রহণ এবং তৃতীয়তঃ তুলনার দ্বারা সাদৃশ্য-নিরূপণ ও উক্ত অবস্থার স্বরূপ-অবধারণ। কাজেই দেখা যাইতেছে, এরূপ-ভাবে বিচার করিয়া সৌন্দর্য্য-নিরীক্ষণ-ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই আছে। তবে ইহাও ঠিক্ যে, এই সমগ্র মানসিক প্রক্রিয়াটী (spontaneous) স্বতঃ উৎসারিত। যিনি চক্ষুষ্মান্, তাঁহার মনের মধ্যে চকিতে সমস্ত ভাবটী খেলিয়া যায়;—যাঁহার দৃষ্টি নাই, শত প্রয়াসেও তিনি সত্যকে দেখিতে পাইবেন না। এই সঙ্গে বলা আবশ্যক সত্য এবং সুন্দর পৃথক্ বস্তু নহে—একই বস্তুর দুই বিভিন্ন রূপ। যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা সত্য এবং যাহা সত্য তাহা সুন্দর না হইয়াই পারে না।* সত্য সুন্দর অনন্তের দুই অঙ্গ; সুতরাং সত্য-সুন্দরের অনুসন্ধানে আমরা অনন্তেরই অনুসন্ধান করি। রূপানুরাগের অন্তরালে অরূপের প্রেম প্রচ্ছন্ন। সান্তের কোন প্রকাশই অরূপের আভাস দিতে অক্ষম। সেই জন্য শিল্পী নিজের শ্রেষ্ঠ চিত্রদর্শনেও তৃপ্ত হয় না—তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর।

সুবিখ্যাত কলাবিষয়ক লেখক 'রাস্কিন' তাঁহার "মডার্ণ-পেণ্টার্স"-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে-সত্যটী আমরা ফুটাইতে চাই সেইটাই হইল আসল; কেমন করিয়া সেটী প্রকাশ করিলাম, তাহা অনাবশ্যক এবং তাহার উপর চিত্রকরের গৌরব নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি "ওল্ড শেপার্ডস্ চিফ্ মোর্ণার" নামে একখানি চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিত্রে কুকুরটীর লোমগুলি মসৃণ ও কুঞ্চিত, কম্বলের ভাঁজগুলি, কফিনের উপরের সুন্দর চিত্রগুলি অতিনিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।—এই সমস্তকে এই চিত্রের ভাষা বলা যাইতে পারে কিন্তু কাঠের গাত্রে কুকুরটীর গাত্রাবমর্ষণ, পাগলের মত নখ দিয়া কম্বলখানি আঁকড়িয়া ধরা, পীড়িত ব্যক্তির একান্ত অসহায় ভাব, নৈরাশ্যব্যঞ্জক অশ্রুসিক্ত চক্ষুর্দ্বয়, নিতান্ত নিঃসাড় নিদ্রার মাঝে ও রোগের শেষ আক্রমণের অসহ্যবেদনার পরিস্ফুট চিহ্ন, গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার ও মৌনশান্তি, অদূরে উন্মুক্ত বাইবেলখানি, মুমূর্ষুর নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা—জীবনের সায়াহ্নে ধরণীর নিকট বিদায়

* Keats.

লইবার সময়ও দুইবিন্দু অশ্রু ফেলিবার জন্য কেহ কাছে নাই!—এই-সব ইহার ভাব। এবং এই ভাবের সমাবেশহেতু অঙ্কন-কুশলতায় ইহার সমকক্ষ অন্য একখানি চিত্র হইতে ইহার শ্রেষ্ঠতা। এই ভাব-সন্নিবেশেই এই ছবিখানি মাধুর্য্য ও মহনীয়তার মহৎ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এখানে শিল্পী পোষাকপরিচ্ছদ ও জীব-অবয়বের অন্ধ অনুকারিমাত্র নহেন, পরন্তু তিনি তাঁহার আত্মাকে লোকসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন।

এ-কথা বলা কঠিন, ঠিক্ কোন্‌খানে ভাষার শেষ এবং ভাবের আরম্ভ। প্রত্যুত দেখা যায়, কতকগুলি ভাব ভাষার সহিত এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত যে ঠিক্ উপযুক্তভাষায় প্রকাশ না করিলে তাহাদের অর্দ্ধেক লাবণ্য নষ্ট হইয়া যায়। তবে এ-কথাও ঠিক যে, শ্রেষ্ঠ "আর্ট" পরিচ্ছদ-পরিপাট্যের উপর বেশি নির্ভর করে না। আমাদের ভারতীয় চিত্রকলা এই গভীর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভাষা এখানে কিছুই নয়, ভাবই সব। গ্রীক্ চিত্রকলার অঙ্গসৌষ্ঠব ইহাতে নাই—গ্রীকচিত্রসুলভ আবয়বিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ নাই, কিন্তু আছে ভাবের মহনীয়তা, প্রকাশের কুশলতা, মানবহৃদয়বৃত্তির সহিত অসামান্য পরিচয়, ভারতের সর্ব্বদেশ-স্বীকৃত আধ্যাত্মিক মহিমার অনবদ্যতা। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর সি-আই-ই ও তাঁহার সতীর্থ এবং অনুতীর্থগণ আমাদের এই লুপ্তগৌরব কলাশিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে প্রাণপণ যত্ন করি-তেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পের বাহ্য চাকচিক্যে অন্ধ আমরা ইঁহাদের যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিতেছি না। এই সকল ভারতীয় শিল্পগুরু-গুরগণের রীতিমত প্রয়াস সত্ত্বেও দেশের লোকের অনুরাগ ভারতীয় কলাশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি-অনুসারে অঙ্কিত কোন চিত্র দেখিলেই শুনিতে পাই, সমলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, প্রচুর পরিমাণে প্রাজ্ঞতার ভাণ করিয়া কেহ বলিতেছেন—"হাত-দু'খানা দেখেছ!—ভূতের মত লম্বা! আচ্ছা স্বীকার কচ্ছি না হয়, চেহারার কিছু নেই, ভাবই সব; কিন্তু চেহারা ভাল হলে ভাব থাক্‌বে না এমন কোন মাথার দিব্য দেওয়া আছে!" আমাদের উত্তর,—ভাল চেহা-রায় ভাল ভাব থাকিতে বাধা নাই সত্য, কিন্তু ভাল চেহারায় ভাব কতক পরিমাণে চাপা পড়ে, এ-কথাও সমান সত্য। ভাল চেহারাটী দেখিলে আমরা তাহাই লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়ি যে, ভাবের খবর লইবার সুবিধা আমাদের ঘটিয়া উঠে না। "কনে" দেখিতে গিয়া যেমন অনেক সময় তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া গুণের পরিচয় লইতে ভুলিয়া যাই, কিন্তু রূপ জিনিষ-টার অভাব থাকিলে গুণের হিসাব-নিকাশ না করিয়া ছাড়ি না। ডাচ্ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ চিত্রেই আমরা চিত্রকরের অর্থহীন বাক্যসমষ্টি লইয়া নিরর্থক বাগ্মিতার পরিচয় পাই। তাহাতে জাঁকজমক আছে, প্রাণ নাই। (আমাদের বঙ্গ-দেশের আধুনিক চিত্রকরগণ শ্রীযুক্ত গণেশ,শীতল নরেন সেন প্রভৃতি তুলনীয়।) অপরপক্ষে কিমা-বিউ অথবা গিয়োটোর প্রথম অঙ্কিত চিত্রগুলি শিশুর অস্ফুট মুখোচ্চারিত হইলেও জলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী বহন করিয়া আনে। ভ্যাসারি বলেন, "মাইকেল এঞ্জিলো জীবনে মাত্র এক-খানি তৈলচিত্র আঁকিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার

কখনও আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলিতেন, এই সকল নিয়স্তরের জিনিষ স্ত্রীলোক ও শিশুদেরই শোভা পায়।" সার জোশুয়া রেণল্ডের মতে "বর্ণবিন্যাসের অল্পতা, আলো ও ছায়ার এরূপ সমাবেশ যাহাতে চিত্রের বিষয় হইতে মন দূরে চলিয়া না যায়—তাহাই শিল্পীর প্রধান গুণ।" রাসকিন্ বলেন, 'এক তিল ভাবসন্নিবেশের নিকট পর্ব্বত-প্রমাণ প্রকাশ-দক্ষতাও নগণ্য।" এখানে জন-সাধারণের রুচির কোনই মূল্য নাই ; কারণ, সমকক্ষ অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যতীত কেহই কোন কিছুর যথার্থ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধারণ হয় অজ্ঞতা-বশতঃ যোগ্য সমাদর করিবে না, অথবা খুব বেশী রঞ্জিত করিয়া বলিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনায়ক সান্যাল।

শিশুর শিক্ষায় ফ্রোবেল।

পেষ্টালট্সি তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষা-সংস্কারকদিগের উপর যে ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতিশয় গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ। অন্তরস্থিত বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ভাবরাজির—এক কথায়, চিত্তবৃত্তির সর্ব্বপ্রকার সমঞ্জসীভূত পূর্ণ পরিচালনার সুযোগ ও সুবিধা কিরূপে শিশুকে প্রদান করা যায়, তাহাই শিক্ষার প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সুমীমাংসা করিতে হইলে, দেখা আবশ্যক যে, শিশুর সেই বৃত্তিগুলির প্রকৃতি কিরূপ ; কি-প্রণালীতে জ্ঞান অর্জ্জিত, সজ্জিত ও সঞ্চিত হয় ; হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসমূহ কি-ভাবে পরিচালিত হইলে নৈতিক জীবন সহজে গঠিত হইতে পারে ; কিরূপ শাসন ও শিক্ষার গুণে ইচ্ছাশক্তি তীব্রবাসনা ও উদ্দাম রিপুসমূহের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মানবের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে পারে ; কি উপায়ে শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মানব সুখে জীবন-যাপন করিতে পারে। পেষ্টালট্সির উপযুক্ত শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ এ-বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন এবং গুরুদত্ত মূলমন্ত্রের সাধনা করিয়া এক নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই শিষ্য (Herbart) জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপারে স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মনোবৃত্তির যথোপযুক্ত প্রণালীবদ্ধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম অনুভব করেন। তাঁহাকে আধুনিক ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞানের (Modern experimental psychology) 'জনক' এই আখ্যা প্রদান করিলে অত্যুক্তি হয় না। যদিও তাঁহার প্রচারিত অনেক তত্ব অপূর্ণ, অদ্ভুত ও সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তথাপি তিনি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের অধিকারভুক্ত ও অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনিই প্রচার করিয়াছেন যে, মানবের চেতনা অনুভূতিপ্রসূত ; সুতরাং, শিক্ষাগুণে তাহা রূপান্তরিত হইতে পারে। তিনিই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—নৈতিক জীবন-লাভ, এবং মনোবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ ও গঠনের উপর উহা নির্ভর

করে; সুতরাং শিক্ষার সাহায্যে উহার উন্নতি সহজ-সাধ্য। হার্ব্বার্টের ভ্রমত্রুটির নিরসন করিয়া তদীয় শিষ্যগণ তৎপ্রচারিত সত্যকে আজ শিক্ষা-জগতে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হার্ব্বার্ট শিক্ষাকে বিজ্ঞানের আসনে বসাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের নিকট-সম্পর্ক-সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু পেষ্টালট্‌সির ন্যায় শিক্ষাকার্য্যে চিরজীবন নিযুক্ত থাকিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানবলে শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে, ফ্রোবেল যে নবভাবের ও নব-প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অননুমেয় ও অতুলনীয়।

কুমার-কানন-শিক্ষা-পদ্ধতি-প্রবর্ত্তক ফ্রোবেল শিক্ষাসংস্কারকদিগের মুকুট-মণি। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, শিক্ষা মানব-প্রকৃতির সজ্ঞান ক্রমোন্মেষ (Conscious Evolution) ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'কুমার-কানন; এই কথাটির ভিতরেই ফ্রোবেলের গূঢ় শিক্ষা-মত অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উদ্যান-পালকের সস্নেহ যত্ন ও সদয় পরিচর্য্যা-গুণে উদ্যানে চারাগাছগুলি যেরূপ আপনা হইতে নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী পথে দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, বিদ্যালয়ে শিশুদিগকেও তদ্রূপ স্বভাবানুমোদিত পথে স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষক শুধু দূরে দাঁড়াইয়া, শিশুর ক্রমবর্দ্ধনশীল অবাধগতির পথে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া, উহাকে সদয়ভাবে ও স্নেহসহকারে স্বভাবানুমোদিত পথে পরিচালিত করিবেন।

আমরা সকলেই সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান; ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের সকলের ভিতরেই নিহিত আছে। সেই আত্মনিহিত ঐশী শক্তির উন্মেষ- ও বিকাশ-সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃতির অন্যান্য জীব-জগতে যেরূপ ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হয়, মানব-মনও সেইরূপ বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতির পথে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। এই অব্যাহত নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে। যে আত্মশক্তি শৈশবে অঙ্গসঞ্চালন-ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদ প্রমোদে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পায়, সেই আত্মশক্তিই বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বিবৃদ্ধ হইয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে আমাদের প্রধান সহায়রূপে দণ্ডায়মান হয়। কাজেই এই সুপ্তশক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তোলা, জীবনের বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে উহার নিয়োগ করা—এক কথায়, উহার ক্রমবিকাশ-সাধন করাই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

এই অন্তর্নিহিত দেব-শক্তিকে জাগ্রৎ করিতে হইলে, সাধনা চাই। সেই সাধনার মূলে কর্ম্ম। ফ্রোবেল বলেন—"প্রথম হইতে কর্ম্ম যদি ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়, তবেই হৃদয়ের ধর্ম্ম-মূল সুদৃঢ় হয় ও ধর্ম্ম-জীবন ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিতে পারে। কর্ম্ম-বিহীন ধর্ম্ম স্বপ্নের ন্যায় অলীক ও শূন্যগর্ভ; উহা অলস মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। সেইরূপ আবার ধর্ম্মবিহীন কর্ম্ম,—উহা শিল্প-কর্ম্ম বা যে কোন কর্ম্মই হউক্ না কেন—মানবকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করে, অথবা তাহাকে শুধু জড়-যন্ত্ররূপে পরিচিত করে। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বিজড়িত থাকিবে; কারণ,

অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বর অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-কার্য্যেই ডুবিয়া আছেন।'' *

এই ধর্ম্মভাব শিশুজীবনে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্তভাবে বিরাজিত থাকে। শিশু-চরিত্রে এই ভাবের পরিপুষ্টি- ও ক্রমোন্মেষ-সাধনকল্পে জনক-জননী ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া সন্তানের সমক্ষে সর্ব্বদা ধর্ম্মমূলক সদৃষ্টান্ত ধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি শৈশবে এই ভাব বিকশিত ও পরিপুষ্ট না হয়, তাহা হইলে ফ্রোবেলের মতে ভবিষ্যৎ জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবের সঞ্চার হইতে পারে না। মানুষ শুধু আত্মরক্ষার জন্য বা জীবন-ধারণোপযোগি-দ্রব্য-সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, ইহা ফ্রোবেলের নিকট অতীব হেয় ও ঘৃণ্য আদর্শ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ফ্রোবেল পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, মানব প্রধানতঃ তাহার অন্তর্নিহিত দেব-দত্ত ভাবরাজিকে বহির্জগতে প্রকাশ করিবার জন্য কর্ম্মময় জীবন যাপন করিবে। এইরূপ কর্ম্ম-সাধন করিয়াই সে তাহার আদর্শ জীবনের মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি অনুভব করিতে পারিবে।

ফ্রোবেল-প্রবর্ত্তিত আদর্শ ইউরোপের পক্ষে নূতন হইলেও ভারতের পক্ষে কিছুই নূতন নয়। ইহাই ভারতীয় শিক্ষার চিরন্তন বা সনাতন আদর্শ। ফ্রোবেলের শিক্ষা-মত সেই পরিস্ফুট আদর্শের অপরিস্ফুট প্রতিধ্বনি-মাত্র। কিন্তু ভারতবাসী আত্ম-বিস্মৃত জাতি। ভারতের জাতীয় ভাব, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সভ্যতা, তাহার যাহা কিছু নিজস্ব, সকলই সে আজ পরের হাতে সমর্পণ করিয়াছে; পরের মুখে না শুনিলে সে নিজের দেশের অতীত গৌরবের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই আত্ম-সম্মান-বোধ ও আত্মনির্ভরশীলতার অভাবেই ভারত আজ দীন-হীন দশায় উপনীত। তাই ফ্রোবেলের মুখে আমি আমার দেশবাসীকে তাহার শিক্ষার আদর্শ শুনাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না।

শিক্ষার উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও, এই আত্মশক্তিই যে সকল শিক্ষার মূলে নিহিত আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কি জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপার, কি জ্ঞানানুশীল ও জ্ঞানাভ্যাস (মনন ও নিদিধ্যাসন) কি জ্ঞানের মূর্ত্ত অভিব্যক্তি,— সর্ব্বত্রই বালক তাহার আত্মশক্তি নিয়োগ করিবে। যে জ্ঞান আত্মশক্তির এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনও চিরস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সকল কার্য্যেই আত্মশক্তি প্রয়োগ করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই আত্মশক্তিই শৈশবে আত্মচেষ্টা বা ক্রীড়াশক্তি-রূপে প্রকাশ পায়; এই আত্মশক্তিই বাল্যে ধীশক্তি ও কল্পনাশক্তিরূপে প্রকাশ পায়; এই

---

* উক্ত ভাবটি ফ্রোবেল তাঁহার প্রাণস্পর্শি ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

Early work, guided in accordance with its inner meaning, confirms and elevates religion. Religion, without industry, without work, is liable to be lost in empty dreams, worthless visions, idle fancies. Similarly, work or industry without religion degrades man into a beast of burden, a machine. Work and Religion must be concomitant; for God, the Eternal, has been creating from eternity."

আত্মশক্তিই যৌবনে নূতনত্বের ইচ্ছা ও উদ্ভাবনী শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। শৈশব হইতে এই আত্মশক্তির যথাযথ ব্যবহার করিয়া শিশু যাহাতে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা দেখাই শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর প্রধান কার্য্য। সুতরাং তাঁহারা কখনও শিশুর স্বাভাবিক ক্রীড়া-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন না; উহাকে সুপথে পরিচালিত করাই, তাঁহাদের কার্য্য। ভাঙ্গা-গড়া জগতের নিয়ম। শিশুজীবনও সেই নিয়মেরই অধীন। এই প্রবৃত্তি শিশুর অজ্ঞাতসারে যাহাতে নিত্য নূতন জিনিষ গঠনের দিকে চালিত হয়—তাহা দেখাই শিশুর অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণের, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর প্রথম কর্ত্তব্য। এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়াই ফ্রোবেল তাঁহার "কুমার-কানন"-শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন।

ফ্রোবেলের পূর্ব্বে, মানবজীবনের শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন প্রভৃতি অবস্থার শিক্ষাকে বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র মনে করা হইত। সকল অবস্থার ভিতরেই যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ—একটা অখণ্ড সূত্র রহিয়াছে, সকল অবস্থাই যে এক চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার আয়োজন করিতেছে, এক অবস্থার শিক্ষা অবজ্ঞাত বা পরিত্যক্ত হইলে যে অন্য অবস্থার শিক্ষা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না—এই ধারণা তখনও লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। শৈশব-শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর প্রদর্শন করিয়া, তাহারা শুধু জীবনের অন্যান্য অবস্থার শিক্ষা লইয়াই বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল। ফ্রোবেল সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের এই ভ্রম প্রদর্শন করেন। তিনি দেখাইলেন মানব-জীবনের ক্রমোন্মেষ যেরূপ অবিচ্ছিন্ন, মানব-শিক্ষার ধারাও তদ্রূপ অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং, শৈশব-শিক্ষাকে কিছুতেই অবহেলা করা যায় না; শৈশবশিক্ষা অনাদৃত হইলে শিক্ষার অঙ্গহানি হইবে। তাই তিনি শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং এই সংস্কার-কার্য্যে দেহ-মনঃ-প্রাণ অর্পণ করিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জার্ম্মেণীর অন্তঃপাতী ব্ল্যাঙ্কেনবার্গ-নামক একটি গণ্ডগ্রামে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শিশুবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু তখনও তিনি এই বিদ্যালয়ের কোনও নামকরণ করেন নাই। এখানে যে গৃহে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সম্মুখভাগে প্রাচীরগাত্রে প্রস্তর-ফলকে এখনও এই কয়টি কথা লিখিত আছে —"ফ্রেড্রিক ফ্রোবেল এই স্থানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুন সর্ব্বপ্রথম কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন।" এই সময় হইতেই তৎ-প্রতিষ্ঠিত শিশুবিদ্যালয় কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ "কুমার কানন" বলিয়া অভিহিত হয়।

জনক-জননী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সমবেত চেষ্টার উপর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। সুতরাং, তাহার শিক্ষা-বিধানের সুনিয়মগুলি জানিয়া রাখিয়া তদনুসারে তাঁহাদের উভয়েরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বঙ্গদেশে শিশুবিদ্যালয় বলিয়া কোনরূপ বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত সাধারণের তাদৃশ মনোযোগের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে যে প্রণালীতে